বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

বংশ-পরিচয় ; বাল্যজীবন

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়।

অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সংগ্রহ 'সঞ্জীবনী-সুধা'র ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাদের বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।—

> অবসতি গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় একশ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামনিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র ও যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র এবং বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণের দৌহিত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই জন—শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র; কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র। প্রত্যেকেই কৃতবিদ্য; 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বিতীয় সম্পাদক এবং 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'কণ্ঠমালা', 'মাধবীলতা'র লেখক সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন।

পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে শিক্ষালাভ করেন; অল্প বেতনের সরকারী চাকরি করিতে করিতেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের (বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-বৎসরে) জানুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুরে ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ

করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৩ মাঘ ১২৮৭) ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমের 'হাতেখড়ি' হয়। পরে গ্রাম্য পাঠশালার গুরু মহাশয় রামপ্রাণ সরকার বাড়ীতে তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবেই মেধাবী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

গ্রামে পাঠ সমাপ্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে আগমন করেন; ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে তিনি সেখানকার ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সময় এফ. টীড্ নামে এক জন সাহেব মেদিনীপুর ইংরেজী স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য-ভাগে তিনি ঢাকায় বদলি হইলে তাঁহার স্থলে সিনক্লেয়ার নিযুক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার সহোদর এবং প্রায়-সহাধ্যায়ী পূর্ণচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

> বঙ্কিমচন্দ্র কখনও পাঠশালায় পড়েন নাই, আমার জ্ঞানে ত নহে।...তাঁহাকে একজন private tutor সকালে ও সন্ধ্যার পর পড়াইয়া যাইত।—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সঙ্কলিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪২।
>
> বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসেই থাকিতেন। পিতৃদেব তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ যত্নবান্ ও সতর্ক ছিলেন। শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরে শিক্ষা পান।...শুনিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র এক-দিনে বাঙ্গালা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে একটী হাই স্কুল ছিল। টিড্ নামে একজন বিলাতী সাহেব উহার হেড মাষ্টার ছিলেন। ...তাঁহার অনুরোধেই অতি শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাঁহাকে ডবল প্রোমোশন দিতে চাহিলেন, কিন্তু পিতৃদেবের

আপত্তিতে তাহা ঘটিল না।...মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাঁটাল-পাড়ায় বাস করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নূতন Session খুলিলে, তথায় ভর্ত্তি হইবেন, স্থির হইল। তাঁহার জন্য গৃহে একজন প্রাইভেট্ টিউটর নিযুক্ত হইল।—ঐ, পৃ. ৩৪-৩৬।

সৌভাগ্যক্রমে সঞ্জীবচন্দ্রের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই শৈশব-শিক্ষার সামান্য বর্ণনা দিয়াছেন—

আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কলেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না, আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুরে গেলাম। সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল।...পরীক্ষার (জুনিয়র স্কলারশিপ, সঞ্জীবচন্দ্রের) অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম...।

"কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা কবিতা শিখিলেন।"* কাঁটালপাড়া-নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ নামক এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের নিকট তিনি পাঠ লইতেন।† "বাঙ্গালা কবিতাগুলি—যাহা সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত।" 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে'র অনেক কবিতা তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি তাঁহার সংস্কৃত

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৩৬। † অক্ষয় দত্তগুপ্ত : 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৩৩।

আবৃত্তি শুনিয়া প্রীত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার ঘরে আসিতেন ও মহাভারতের কথা শুনাইতেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপবর্ণন ও গীতগোবিন্দের 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে' কবিতাটি তিনি প্রায়ই আওড়াইতেন। শৈশবে হলধর তর্কচূড়ামণির নিকট তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র"।* এই বীজ হয়ত উত্তরকালে 'কৃষ্ণচরিত্র'-রূপ মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল।

শৈশবে বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধুলা ভালবাসিতেন না—তাঁহার শরীর এই কারণে অপটু ছিল। তিনি তাসখেলা পছন্দ করিতেন। "বঙ্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাঁড়গরু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া যাইতেন, মই দিয়া ছাদে উঠিতে পারিতেন না, সাঁতার জানিতেন না,...কখনও ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন না।"* অথচ মাঝে মাঝে বৃহৎ ব্যাপারে অসমসাহস দেখাইতেন। ইতিহাস-অধ্যয়নে বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ঝোঁক ছিল।†

মেদিনীপুর হইতে কাঁটালপাড়া প্রত্যাবর্ত্তনের কিছু দিনের মধ্যেই ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি সুন্দরী বালিকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়।

ছাত্র-জীবন

হুগলী কলেজ

২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে (তখন 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত) প্রবেশ করেন। তখন

---

* 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ৪১, ৪৫। † দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ, ১৩১৮।

তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বৎসর। কলেজে রক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন নথিপত্রের মধ্যে একটি বিপুলায়তন "অ্যাডমিশন বুক" (১৮৬২) আছে, তাহার ১০১ সংখ্যক লিপিপংক্তি অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

	Age	Date of Admission	Date of Withdrawal
101. Bankim Chunder Chatterjee	11½	28 Oct. 1849	12 July 1856 Transfd. to Pres. College.

তৎকালে বিদ্যায়তনে সম্বৎসর (সেসন) গণনা হইত ১ অক্টোবর হইতে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর মাসেই বৃত্তি-পরীক্ষা ও বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হইয়া "দশহরা"র দীর্ঘ অবকাশের পর নূতন পড়া আরম্ভ হইত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ছুটির তালিকায় পাওয়া যায়, সম্বৎসর-মধ্যে মোট ছুটি মাত্র ৬১ দিন, তন্মধ্যে ৩৫ দিন পূজার ছুটি মহালয়া হইতে আরম্ভ। তখনও গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহালয়া ছিল ১৬ সেপ্টেম্বর; সুতরাং বৎসরারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র ভর্ত্তি হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ যে-বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেন, হুগলী কলেজের ইংরেজী-বিভাগ—কলেজ ও স্কুলে বিভক্ত ছিল। স্কুল-বিভাগের উচ্চ ভাগে (সিনিয়র ডিবিসনে) তিনটি শ্রেণী, প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন এবং নিম্ন ভাগে (জুনিয়র ডিবিসনে) চারিটি শ্রেণী, প্রথম তিনটি শ্রেণীর দুইটি করিয়া সেকশন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর "এ" সেকশনে ভর্ত্তি হন। তখন জুনিয়র ও সিনিয়র ডিবিসনের ছাত্রদিগকে মাসিক বেতন যথাক্রমে দুই টাকা ও তিন টাকা দিতে হইত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র বৈতনিক ছাত্র ছিলেন।

স্কুলের প্রত্যেক সেকশন এক জন মাত্র শিক্ষকের অধীন থাকিত এবং তিনি বাংলা ভিন্ন সমস্ত বিষয়েই অধ্যাপনা করিতেন। যাঁহার হস্তে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হয়, তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র দাস (১-৫-১৮৫০ তারিখে বেতন ১০০৲, বয়স ২৭)। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অল্পায়ু যদুনাথ দাস হুগলী কলেজেরই অতিপ্রসিদ্ধ কৃতী ছাত্র ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে নবীনচন্দ্র ১৫০৲ বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত বীরভূম-স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন এবং পরবর্ত্তী কালে বহু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি তন্তুবায়-জাতীয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, তাহা বহু কৃতী ছাত্রে পরিপূর্ণ ছিল। এই বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষার সম্পূর্ণ বিবরণ মুদ্রিত পাওয়া যায়।* "এ" সেকশনে দুই জন সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার পাইয়াছিলেন—উমেশচন্দ্র শূর ও বঙ্কিমচন্দ্র। কৌতূহলী পাঠকের জন্য এই শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা প্রদত্ত হইল :—

Literature :	Azimghur Reader
	2nd Poetical Reader
	Pinnock's Catechism of English History
Grammar :	Lennie's Grammar
	(to 20th Rule of Syntax)
	Writing
Arithmetic :	Extraction of the Square Root
	Vulgar fraction
Geography :	Stewart's Geography
	(Europe, Asia and Africa)
Bengali :	History of Bengal (বঙ্গেতিহাস) 51 pp.
	Gynarnub (জ্ঞানার্ণব) 95 pp.

* *General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency* for the year 1 Oct. 1849 to 30 Sept. 1850, pp. 101-06.

১৮৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র ডিবিসনের তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে পড়িয়াছিলেন এবং এবারও বৎসরান্তে সাধারণ পারদর্শিতার পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী উমেশচন্দ্র শূরও "বি" সেকশন হইতে অনুরূপ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। "এ" সেকশনের শিক্ষক ছিলেন মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১-৫-৫০ তারিখে বেতন ১৩০৲, বয়স ৩৩)—ইনি প্রথিতনামা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। "বি" সেকশনের শিক্ষক Ure সাহেবের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন নাই।

পর-বৎসর (ইং ১৮৫১-৫২) দ্বিতীয় শ্রেণীর "এ" সেকশনে বিখ্যাত শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের* নিকট বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন,—"বি" সেকশনের ক্লারমণ্ট (F. W. Clermont) সাহেবের নিকট পড়েন নাই। তখনও শিক্ষা-বিভাগে বহু সাহেব শিক্ষকতা করিতেন। বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃযুগল দেশীয় শিক্ষকদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু সাহেবদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইঁহাদের পদোন্নতি বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রসাদ ঘোষ-সম্পাদিত 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় হুগলী কলেজের প্রধান শিক্ষক গ্রেভ্‌স (Graves) ও নবনিযুক্ত ব্রেন্যাণ্ড (Brennand) সাহেবদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনাপূর্ণ কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশ্যে অস্বীকৃত হইলেও, কলেজের অধ্যক্ষ কার্ (Kerr) সাহেব তাঁহার ১৯-৯-৫০ তারিখের সুদীর্ঘ পত্রে ঐগুলি বন্দ্যোপাধ্যায়-ভ্রাতৃদ্বয়েরই লেখা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।† দ্বিতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পুরস্কার পাইতে পারেন নাই—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণীর

---

* *Hooghly College Register* 1836-1936, p. 158.

† Zachariah : *History of Hooghly College*, p. 69.

পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন যাদবচন্দ্র রায় (সেকশন "বি") ও যদুনাথ মিত্র (সেকশন "এ")।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে তিনি প্রথম শ্রেণীর "বি" সেকশনে উন্নীত হন। পর-বৎসর হইতে বিদ্যালয়ের সম্বৎসর (সেসন) পরিবর্ত্তিত হইয়া ১ মে হইতে ৩০ এপ্রিল পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় এবং কলেজ-বিভাগে গ্রীষ্মের ছুটি (১৬ এপ্রিল হইতে ৩১ মে পর্য্যন্ত দেড় মাস) নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।* সুতরাং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরীক্ষা না হইয়া ১৮ মাস অন্তে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সকল শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথম শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল শিক্ষকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—

Head Master	J. Graves B. A. :	Literature and History
Second Master	W. Brennand :	Mathematics and Geography

ইঁহারা উভয়েই কলেজেও পড়াইতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্রেন্নাণ্ড সাহেব ঢাকায় বদলি হইয়া যান—তাঁহার স্থলে প্রায় এক বৎসর পরে (১৮-২-৫৪ তারিখে) ফোগো (D. Foggo, B. A.) নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে ব্রেন্নাণ্ড সাহেবের কার্য্যভার অধস্তন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্লারমণ্ট সাহেব ভাগাভাগি করিয়া লন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ঈশানবাবু বদলি হইয়া যান এবং তাঁহার জায়গায় বীনল্যাণ্ড (J. G. Beanland) সাহেব আসেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্ক ও ভূগোল শিক্ষা অল্পবিস্তর উক্ত পাঁচ জন শিক্ষকের নিকটই ঘটিয়াছিল।

---

* Circular of 15-9-53 : General Report...for 1852-55, p. ccciv. কলেজে মোট ছুটির দিন বৎসরে ৬৫, তাহার মধ্যে গ্রীষ্মের ছুটি ৪৫ দিন ও পূজার ছুটি ১৫ দিন। ১৬-৯-৫৩ তারিখের সার্কুলার অনুসারে স্কুল-বিভাগের ছুটির সংখ্যা ৫০ দিন নির্দ্দিষ্ট হয়—৩৫ দিন পূজার ছুটি পূর্ব্ববৎ, কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটি নাই।

তখনও এনট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই; ছাত্রেরা জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা তখন প্রত্যেক স্থানে পৃথক্ পৃথক্ লওয়া হইত। হুগলী কলেজে ও তাহার অধীন স্কুলসমূহ হইতে মোট ৭৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বতন প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার বিস্তৃত ফলাফল মুদ্রিত হইয়াছে।* (বাংলা ভিন্ন) মোট সাতটি বিষয়ের মধ্যে ছয়টি বিষয়েই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, কেবল এক বিষয়ে (অনুবাদ) তাঁহার স্থান দ্বিতীয়। বৃত্তি-পরীক্ষার সৃষ্টি অবধি, মফস্বলের দুই-তিন জন পরীক্ষার্থীর কথা ছাড়িয়া দিলে, আর কেহই বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। যাঁহারা বৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উদ্ধৃত হইল :—

	ব্যাকরণ	ইতিহাস	গণিত	ইংরাজি	সাহিত্য	অনুবাদ	মৌখিক পরীক্ষা	মোট
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৫	৪১	৩০	৪৬	৪০	৩৪.৫	৩৯	২৭৫.৫
যাদবচন্দ্র রায়	৪১	৩১	৩০	২১.৫	৩৭	৩৬.৭৫	৩২	২২৯.২৫
রসিকলাল দত্ত	৪৩	২৯	১৫	৪০.৫	৪০	২৬.৭৫	৩৪	২২৮.২৫
শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৪৩	৩৩	২৪	২৯	৩৫	৩৩.৭৫	২৮	২২৫.৭৫
কুমুদচরণ বসু	৩৬	৩৮	১৬.৫	৩৪	৩৯	২৭	৩২	২২২.৫
উমেশচন্দ্র শূর	৪২	২২	২৩	৩৫	৩৭	৩১	২৭	২১৭
নবকৃষ্ণ রায়	৪৩	৩০	১৫.৫	২৯.৫	২৫	৩১.২৫	৩৬	২১০.২৫

বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী (প্রথম শ্রেণী, "বি" সেকশন) মোট ৩৫ জন, তন্মধ্যে ২৩ জন বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়াছিল। ইহাদের বয়স গড়ে ১৭

* General Report...1852-55. App. D. pp. ccexxxviii—cccxlv.

ছিল। "এ" সেকশনের ছাত্রদের বয়স ছিল ১৮। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষার সময় ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হন নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা এই* :—

Prose :	Selections from Goldsmith's Essays, Cal. Ed.
Poetry :	Selections from Pope, Prior and Akenside
	Poetical Reader No. III pt. II (last ed.)
History :	Keightley's History of England, Vol. I
Grammar :	Crombie, part II
Geography and Map Drawing	
Mathematics :	Euclid Books VI and XI
	Algebra to the end of simple Equations.
	Arithmetic
Bengali .	বেতালপঞ্চবিংশতি (2nd Ed.)
	Bengali Grammar

পরীক্ষা পাঁচ মাস পিছাইয়া যাওয়ায় এ বৎসর অতিরিক্ত (Supplementary) পাঠ্যও নির্দ্দিষ্ট হয়,† যথা—

Prose :	Moral Tales, Encyclopaedia Bengalensis No. X
Poetry :	Poetical Reader Part I, No. III (Cal. Ed.)
	Crombie's Etymology & Syntax, part I.

বাংলার পাঠ্যেও নূতন সার্কুলার করিয়া‡ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দ, ১০৫-১১৬ সংখ্যা) নির্দ্দিষ্ট হয়।

এই বৎসর (ইং ১৮৫৩) বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাটির নাম "কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো ষড়ঋতু," ইহা

---

* General Report...for 1851-52, p. xxvi.

† *Ibid.* for 1852-55, App. C, p. cciv.

‡ *Ibid.* p. ccxcix and ccci.

১৮ মার্চ ১৮৫৩ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হয়, বাহুল্যভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।* এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষের একখানি পত্র উদ্ধৃত হইল :—

To the Secy. to the Council of Education, Fort William.

Hooghly the 20th Feb. 1854

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Education that I have received twenty rupees to be awarded to Bunkim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the Senior School, for some good poetical Compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Probakur Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto the Editor of the abovementioned Journal.

J. Kerr
Principal

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুগলী কলেজে পড়িতে পড়িতেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনার আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' গদ্য পদ্য রচনা সুরু করেন। দুই বৎসর ধরিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গদ্য পদ্য রচনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রশস্তি সমেত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত হইতে থাকে।

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় মাসিক ৮৲ বৃত্তি পাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র এইবার কলেজ-বিভাগের চতুর্থ শ্রেণী অর্থাৎ ফার্স্ট ইয়ারে উন্নীত হন। কলেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য একই, কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা পৃথক্ পৃথক্ ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য† :—

English : Addison, (pp. 1-382) as far as No. 265.
Pope, as contained in Richardson's Selections.

* 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী', "বিবিধ", পৃ. ২৩-২৯ দ্রষ্টব্য।

† General Report...for 1855, p. xiv.

Moral Philosophy : Abercrombie's Moral Feelings.
History : Keightley's Hist. of England Vol. II
Physical Geography : Hughes' Physical Geography, pp. 1-99.
Mathematics : Euclid I-VI & XI (up to 21st proposition)
Algebra and Plane Trigonometry.
Surveying and Plan Drawing
Bengali : নির্দ্দিষ্ট পুস্তক কোন শ্রেণীতেই ছিল না, কেবল
Translation ও Grammar.

এই শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নলিখিত অধ্যাপকের নিকট পড়েন :—

Literature :	Principal J. Kerr, M. A. (সপ্তাহে দুই দিন)
	J. Graves, B. A. (Hd. Master)
History :	J. Graves
Mathematics :	R. Thwaytes, B. A. ও D. Foggo, B. A.
	E. Lodge, B. A. (succeeded Foggo from 8-12-54)

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রদের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার নাম "Senior Scholarship Examination" হইলেও তাহা উচ্চতর শ্রেণীর পরীক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং প্রশ্নপত্রও পৃথক্। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং তাঁহার বৃত্তি (৮৲) দ্বিতীয় বৎসরের জন্য পুনঃপ্রদত্ত হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

Literature Proper (70)—39 ; Moral Philosophy and Political Economy (60)—48 ; History (70)—56½ ; Pure Mathematics (100)—49.5 ; Mixed Mathematics (100)—34 ; English Essay (50)—30 ; Translation (50)—24. Total 560—276.

তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত কার্ (Literature), থোয়েট্‌স (Physics and Mathematics) এবং গ্রেভ্‌স (History) সাহেবদের নিকটই পড়িয়াছিলেন। লজ্ সাহেব বদলি হইয়া যান এবং তৎস্থলে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুনঃনিযুক্ত হইয়া আসেন (১০-১-৫৬ হইতে)। ঈশানবাবু তৃতীয় শ্রেণীতে Sheodler's *Book of Nature*
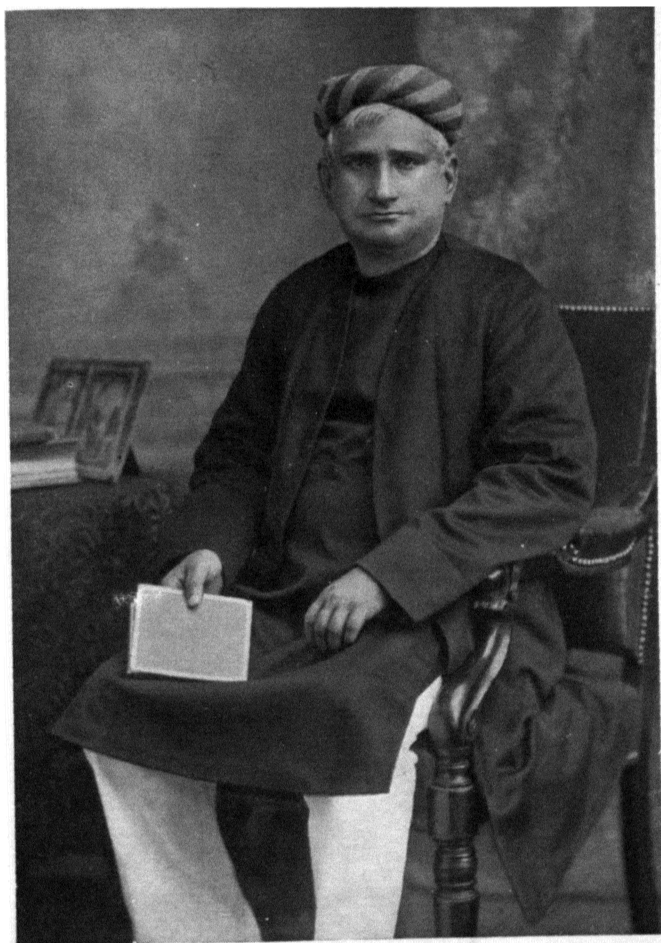
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই শ্রেণী হইতে ১৩ জন সিনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দেন—একমাত্র বঙ্কিমই বৃত্তি-ধারী এবং তিনিই একাকী হুগলী কলেজ হইতে সে-বৎসর "Highest Proficiency in all the subjects" দেখাইয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ থার্ড ইয়ারে উন্নীত হন। এই পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

> Literature 55, History 82, Mathematics 67.5, Natural Philosophy 74.8, Translation 76, Total 354.80.

গ্রীষ্মের ছুটির পর, প্রায় এক মাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র ২৮ জুন ১৮৫৬ তারিখে ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করেন। তদানীন্তন অস্থায়ী অধ্যক্ষ থোয়েট্স সাহেব দরখাস্ত প্রেরণকালে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "Bunkim Chunder is a youth of good character and acquirements." পরবর্ত্তী জুলাই মাসের ১২ই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন,* এবং আইন পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ বৃত্তি লাভ করেন। বৃত্তির এই টাকা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে তিন বৎসরের জন্য ১৩।০ হারে বেতন, এবং নগদ ২৲ করিয়া tuition fee দিবার ব্যবস্থা হয়।†

* যে-সকল ছাত্র সে-বৎসর হুগলী কলেজ পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতেও দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র "থার্ড ইয়ার" হইতেই ট্রান্সফার লইয়াছিলেন। Report of the D. P. I. (1-5-56 to 30-4-57), App. A, p. 185.

† বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী'তে (৩য় সং, পৃ. ৭৭) লিখিয়াছেন, "১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।" ৭৪ পৃষ্ঠাতেও এইরূপ উক্তি আছে। অনেকে তাঁহাদের পুস্তকে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা-সাহিত্যে হাতেখড়ি যাঁহাদের হস্তে হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম পৃথক্ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পঠদ্দশায় হুগলী কলেজে ছয় জন পণ্ডিত বাংলার অধ্যাপনা করিতেন, তন্মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন কেবল কলেজ-বিভাগে পড়াইতেন। বাকি পাঁচ জনের মধ্যে দুই জন—গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি ও ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদ সিনিয়র ডিবিসনে এবং তিন জন জুনিয়র ডিবিসনে পড়াইতেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিম্নতম পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত বিশারদ ও গোপালচন্দ্র বিদ্যানিধি, এই দুই জনের নিকট পড়েন নাই। তাঁহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন কাশীনাথ তর্কভূষণ। জুনিয়র ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্য পুস্তক পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—বঙ্গেতিহাস ও জ্ঞানার্ণব।

সিনিয়র ডিবিসনে উন্নীত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ ভগবচ্চন্দ্র রায় বিশারদের নিকট পড়েন। ইনি এক জন প্রথিতনামা ব্যক্তি। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার 'সুখবোধ' বাংলা ব্যাকরণ দেশের সর্ব্বত্র পঠিত হইত।

সিনিয়র ডিবিসন, তৃতীয় শ্রেণীর "এ" সেক্‌শনের বাংলা পাঠ্যগ্রন্থ মাত্র একখানি—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' অনুবাদ-রচনাদির উপরই বিশেষ জোর ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুবাদ ও রচনা ছাড়া পৃথক পাঠ্য পুস্তক মোটেই ছিল না।

প্রথম শ্রেণীতে দীর্ঘ দেড় বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণির নিকট পড়েন। ইনি কুমারহট্ট-নিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশের পুত্র। এই শ্রেণীর পাঠ্য ছিল—'বেতালপঞ্চবিংশতি' (২য় সং) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৭৭৪ শকাব্দ)।

সুপারিণ্টেণ্ডিং পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন অবসরগ্রহণের

পূর্ব্বেই ৪ নবেম্বর ১৮৫৪ তারিখে (৫৯-৬০ বৎসর বয়সে) হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন—তাঁহার নিয়োগ-তারিখ ছিল ২০-৮-৩৬। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে উঠিয়া তাঁহার নিকট পাঁচ মাস পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎস্থলে ২৫-১-৫৫ হইতে গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ই নিযুক্ত হন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলীর শিক্ষকদের মধ্যে শিরোমণির সংস্পর্শই দীর্ঘতম (অন্যূন তিন বৎসর) হইয়াছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তৎকালে সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত পড়েন নাই—ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্কৃত পড়িয়া ব্যুৎপন্ন হন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর ৩০-৫-৬৪ তারিখের আদেশমূলে এক জন সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপকের পদ হুগলীতে ১৫০৲ বেতনে প্রথম সৃষ্ট হয়। এই পদে স্থায়ী লোক গোপালচন্দ্র গুপ্তের নিয়োগের পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয় এক মাস কাল (মে-জুন ১৮৬৫) অস্থায়িরূপে ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-বৎসর উত্তরপাড়া স্কুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু স্কুল হইতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্ব্বসমেত ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫

জন ও দ্বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয়া তখন কিছু ছিল না। যাহারা সর্ব্বসাকল্যে অর্দ্ধেক বা তদূর্দ্ধ নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা প্রথম বিভাগে, এবং যাহারা অন্যূন এক-চতুর্থাংশ বা অর্দ্ধেকের কম নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।*

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এনট্রান্স পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্য ছিল—কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'; পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত, নিম্নে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin	**G. Smith, Esq., Principal, Doveton College.**
Sanscrit, Bengali and Hindee	**The Revd. K. M. Banerjee, Professor, Bishop's College.**
History and Geography	**E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.**
Mathematics and Natural Philosophy	**W. Masters, Esq. Professor, Metropolitan College.**

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 124.

প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে পড়িতে পর-বৎসর—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র বি-এ. পরীক্ষা দিবার সঙ্কল্প করিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় সর্ব্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্ব্বসমেত ১০ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল ; তন্মধ্যে কেবল মাত্র দুই জন—বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান এবং যদুনাথ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইঁহারা দুই জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র—বঙ্কিমচন্দ্র আইন-বিভাগের, যদুনাথ জেনারেল ডিপার্টমেণ্টের। পরীক্ষা খুব কঠিন হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ ছয়টি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিতে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন,

* **University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 65.**

কিন্তু ষষ্ঠটিতে তাঁহারা উভয়েই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হন। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী ঐ দুই জনকে ৭ নম্বর 'গ্রেস' দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।*

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্যপাঠ্য বিষয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে শেক্সপীয়রের *Macbeth*, ড্রাইডেনের *Cymon and Iphigenia*, অ্যাডিসনের *Essays* প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠ্য ছিল —মহাভারত (প্রথম তিন পর্ব্ব), 'বত্রিশ সিংহাসন', ও 'পুরুষপরীক্ষা'। বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত নিম্নে দেওয়া হইল :—

English, Greek and Latin	W. Grapel, Esq., M. A., Presidency College,
Sanscrit, Bengali, Hindee and Oorya	Pundit Isserchunder Bidyasagar, Principal, Sanscrit College.

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. 24th April.

3. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 18 Candidates for the degree of B. A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Read also a letter from the like Board, recommending, that, two Candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

RESOLVED :—That the two Candidates mentioned, be admitted to the degree of B. A. (University of Calcutta. Minutes for the Year 1858. Pp. 18-19.)

History and Geography	E. B. Cowell, Esq., M. A., Professor, Presidency College.
Mathematics and Natural Philosophy	The Revd. T. Smith, Professor, Free Church Institution.
Natural History and Physical Sciences	H. S. Smith, Esq., B. A., Professor, Civil Engineering College.
Mental and Moral Sciences	The Revd. A. Duff, D. D.

—University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 125.

১১ ডিসেম্বর ১৮৫৮ তারিখের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসুকে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই বি-এ উপাধি প্রদত্ত হয়।*

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীক্ষা দিবার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িতে লাগিলেন। কলেজের হাজিরা-বইয়ে প্রকাশ, তিনি "3rd year Law Student" হিসাবে পরবর্ত্তী ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত কলেজে হাজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাকুরি করিতে করিতে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

বি-এল পরীক্ষায় কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা, পরীক্ষকদিগের নাম সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

---

* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. The 11th December. P. 121.

Jurisprudence	...	Mr. C. J. Wilkinson
Personal Rights and Status	...	do.
The Law of Contracts	...	do.
Rights of Property	...	Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.
Procedure and Evidence	...	do.
Criminal Law	...	do.

কর্ম্মজীবন

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার দীর্ঘ (৩৩ বৎসর) কর্ম্মজীবনের ইতিহাস কম চিত্তাকর্ষক নয়, তাহা ঘটনাবহুল আঘাত-সংঘাতের ইতিহাস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাসও সুষ্ঠুভাবে লিখিত হয় নাই ; এলোমেলো টুকরা টুকরা ঘটনার আভাস এর-ওর-তার স্মৃতিকথায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের সাধ মিটে না। আমরা শুধু দেখিতে পাই, তেত্রিশ বৎসরের পুরাতন কর্ম্মচারীকে গবর্মেণ্ট রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দিয়া সম্মান করিয়াছেন এবং তাঁহারই উর্দ্ধতন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী রচনা করিতে বসিয়া লিখিয়াছেন—

> By 1885 he had risen to the first grade in the Subordinate Executive (now the Provincial) Service, and for some time acted as an Assistant Secretary to the Government of Bengal. He rendered good service in a number of districts and also acted as Personal Assistant to the Commissioners of the Rajshahi and Burdwan Divisions. In June 1867, he was Secretary to a Commission appointed by Government for the revision of the salaries of ministeral officers. While in charge of the Khulna Sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals.—*Bengal under the Lieutenant-Governors*, pp. 1078-79.

বঙ্কিমের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সমব্যবসায়ীর এইটুকু প্রশস্তি ছাড়া অন্য কোনও প্রামাণিক উক্তি পাওয়া যায় না। বিভিন্ন স্থানে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমের জীবনীতে বর্ণিত হইয়াছে, সে-সকল গল্পের পুনরুল্লেখ ভরসা করিয়া করা যায় না।

বঙ্কিমের বারুইপুর ও আলীপুরের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রদীপে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে (আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩০৬) কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনে'ও বঙ্কিমের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ভূদেব-পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আমার দেখা লোক' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত "বারুইপুর পরিদর্শন" শীর্ষক প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র হইতে বুঝা যায়, কোন ডাকাইতি মকদ্দমায় মিথ্যা পীড়নের দায়ে অভিযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারীকে বঙ্কিমচন্দ্র শাস্তি দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ৯ই নবেম্বর তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের বারুইপুরের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> সৌভাগ্যক্রমে বারুইপুরের এলাকাবাসিগণ শ্রীযুত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাস্পদ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুর্ব্বিধ কার্য্য করেন। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী কালেক্টর, দলীলের রেজিষ্ট্রার ও ষ্ট্যাম্পের সংগ্রহাধ্যক্ষ।...বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণের সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্ট বোধ না করিয়া পীড়িত অবস্থাতেও বিচারকার্য্য সম্পাদন করেন।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে বারুইপুরে যে রাসযাত্রা হয়, তাহাতে অসম্ভব জনতার মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শান্তিস্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন। স্বকার্য্য বিষয়িণী কর্ত্তব্যতা পক্ষেও ইঁহার নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন।...অতএব বঙ্কিমবাবু সকল বিষয়েই প্রশংসা ও ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায়নিষ্ঠ দুঁদে ডেপুটি ছিলেন; আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কেহ কখনও তাঁহার নিকট কোনও সরকারী ব্যাপারে প্রশ্রয় পান নাই। একটু সুবিধা চাহিতে গিয়া কেহ কেহ লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়াছেন। শচীশচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এরূপ এক-একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

অত্যন্ত স্বাধীনচেতা বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল; উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারীরা অন্যায় করিলে তিনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, ফলে কয়েক ক্ষেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটদের সহিত তাঁহার ঘোর বিবাদ বাধিয়াছিল। এই বিবাদের ফলে তিনি কম বিপন্ন হন নাই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কখনও তাঁহাকে মাথা নত করিতে দেখা যায় নাই।

মামলায় ন্যায়বিচারে তাঁহার সুনাম ছিল; সকলে সর্ব্বত্র তাঁহার বিচার-কৌশলের উল্লেখ করিত। প্রসিদ্ধ গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'নবকথা'য় "বঙ্কিমবাবুর কাজির বিচার" নামে এরূপ কয়েকটি গল্প প্রচার করিয়াছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২৩এ তারিখে তিনি বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী ছিলেন। হঠাৎ ঐ পদ উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অন্যত্র বদলি করাতে ইউরোপীয় মহলেও চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল; ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে (১৮৮২) 'স্টেট্‌সম্যান' লিখিয়াছিলেন—

Baboo Bankim Chandra Chatterji is a man of high character and attainments,...and we confess our inability to understand the reasons that justify the step.

ভূদেববাবু বলিতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এই চাকুরীর প্রধান অলঙ্কার। তথাপি এই স্বর্ণশৃঙ্খলভূষিত দাসত্বের প্রতি তাঁহার বরাবর একটা ধিক্কার ছিল। নবীনচন্দ্র সেন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার এই মনোভাব বহু বার ব্যক্ত হইয়াছে। মুকুন্দদেবের স্মৃতিকথা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার ন্যায়পরায়ণতাকে পুলিসের লোক এমনই ভয় করিত যে, পারতপক্ষে তাহারা তাঁহার এজলাসে মকদ্দমা দিতে চাহিত না।

সরকারী মহলে বঙ্কিমবাবুর ইংরেজী লেখার খুব সুখ্যাতি ছিল। নথিপত্রের উপর তাঁহার মার্জিন-মন্তব্য এমনই সুলিখিত হইত যে, ঊর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাঁহার রচনা-কৌশলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন; তাঁহার লেখার সংক্ষিপ্ত-তীব্রতার জন্য অনেক সময় তিনি তাহাদের বিরাগভাজনও হইয়াছেন; এক জন নেটিবের লেখায় অত তেজ অনেকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কত দিন রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং কখন কোথায় কি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার সঠিক বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কোন জীবনীতে পাইবার উপায় নাই, অথচ বঙ্কিমের জীবনচরিত-রচনায় এরূপ একটি তালিকার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

সুখের বিষয়, এরূপ একটি তালিকা সঙ্কলন করা দুরূহ নহে। এই কার্য্যের জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি, পুরাতন 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত লেপ্টেনান্ট-গবর্নরের রাজকর্ম্মচারী-নিয়োগাদির আদেশগুলি। দ্বিতীয়টি, অ্যাকাউনটেন্ট-জেনারেলের আপিস হইতে সঙ্কলিত *History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.* এই ইতিহাসের ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের তিনটি খণ্ড

দেখিয়াছি। এই তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্ব্বত্র একরূপ নহে। কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের (এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন) খণ্ডটি "Corrected to 1st July 1891" বলিয়া আমরা এই খণ্ডটিকেই প্রধানতঃ অনুসরণ করিতে পারি।

এই দুইটি উপাদানের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজকার্য্যের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসের তারিখের সহিত 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত নিয়োগাদির তারিখের সর্ব্বত্র মিল নাই; যে-যে স্থলে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি।

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। নিয়োগের তারিখ ও কর্ম্মস্থলে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মভার গ্রহণের তারিখের মধ্যে সে-সময়ে সচরাচর পনর-ষোল দিনের ব্যবধান থাকিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ২১ জানুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-পদে নিযুক্ত হইলেও তিনি তথায় পৌছান ৭ই ফেব্রুয়ারি এবং কর্ম্মভার গ্রহণ করেন পরবর্ত্তী ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
যশোহর	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৫৮, ৭ আগস্ট[1]
নেগুয়াঁ (মেদিনীপুর)	ঐ	১৮৬০, ২১ জানুয়ারি[2]
	ঐ (৫ম শ্রেণী)	১৮৬০, ৭ নবেম্বর

১ বঙ্গের লেপ্টেনাণ্ট-গবর্ন র কর্ত্তৃক নিয়োগের তারিখ ৬ আগষ্ট ১৮৫৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ আগষ্ট ১৮৫৮।

২ মেদিনীপুরে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন বঙ্কিমচন্দ্রের দুইখানি পত্রের নকল পাঠাইয়াছেন। এই দুইখানি পত্রে প্রকাশ, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়াঁ পৌছান এবং পরবর্ত্তী ৯ই তারিখে তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
খুলনা	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০, ৯ নবেম্বর[৩]
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬১ হইতে ১৫ দিন	
	ঐ	১৮৬১, ৫ অক্টোবর
	ঐ (৪র্থ শ্রেণী)	১৮৬৩, ১৩ জানুয়ারি
বারুইপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৬৪, ৫ মার্চ[৪]
	ঐ (অস্থায়ী) ডায়মণ্ড হারবার	১৮৬৪, ২৪ অক্টোবর
	ঐ (৩য় শ্রেণী)	১৮৬৬, ৫ মার্চ
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২২ জুন ১৮৬৬ হইতে ১ মাস ১৬ দিন	
	ঐ	১৮৬৬, ৭ আগস্ট
	গবর্মেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্দ্ধারণ জন্য কমিশনের কাজ	১৮৬৭, ৩১ মে[৫]
	ঐ (অস্থায়ী) আলিপুর, ২৪-পরগণা	১৮৬৭, ১৪ আগষ্ট
	ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ৫ জুন ১৮৬৯ হইতে ৬ মাস*	
	ঐ	১৮৬৯, ৫ ডিসেম্বর

৩ "The 9th November 1860.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, B. A., Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Khoolnah. and to exercise the full powers of a Magistrate in Jessore."—*The Calcutta Gazette*, 17 Nov. 1860.

৪ "The 5th March 1864.—Baboo Bunkim Chunder Chatterjee, Dy. Magistrate and Dy. Collector, to the charge of the Sub-Division of Barripore. and to exercise the full powers of a Magistrate in the 24-Pergunnahs."—*The Calcutta Gazette*, 9 March 1864.

৫ 'ক্যালকাটা গেজেট,' ৫ জুন ১৮৬৭ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাসে তারিখটি ২ জুন ১৮৬৭ আছে।

* ২১ মে ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২৬ মে ১৮৬৯।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
মুর্শিদাবাদ	ডে. ম্যা ও ডে. ক.	১৮৬৯, ১৫ ডিসেম্বর[৬]
	ঐ (২য় শ্রেণী)	১৮৭০, ২৫ নবেম্বর
	বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্‌টাণ্ট (অস্থায়ী)	১৮৭১, ২৫ এপ্রিল[৭]
	ঐ	১৮৭১, ২৮ মে
	মুর্শিদাবাদে কলেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি	১৮৭১, ১০ জুন[৮]
	ছুটি : বিনা-মঞ্জুরীতে দুই দিন—১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল ১৮৭৩	
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ হইতে ৩ মাস	
বারাসত (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৭৪, ৪ মে*
	মালদহে রোড-সেস কার্য্যে (অস্থায়ী)	১৮৭৪, ২৫ অক্টোবর[৯]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ২৪ জুন ১৮৭৫ হইতে ৮ মাস ২৬ দিন	
হুগলী	ঐ	১৮৭৬, ২০ মার্চ[১০]
	ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ হইতে ১১ দিন	
	ঐ	১৮৭৯, ২৮ ফেব্রুয়ারি
	ঐ এবং বর্দ্ধমান-ডিবিসন কমিশনারের অস্থায়ী পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট	১৮৮০, ৬ নবেম্বর
হাবড়া	ঐ ঐ	১৮৮১, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১১]

৬ ২৯ নবেম্বর ১৮৬৯।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১ ডিসেম্বর ১৮৬৯।

৭ ১৫ এপ্রিল ১৮৭১।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১৯ এপ্রিল ১৮৭১।

৮ 'ক্যালকাটা গেজেট', ১৪ জুন ১৮৭১।

* ২৮ এপ্রিল ১৮৭৪।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪।

৯ ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪।—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১০ ১৩ মার্চ ১৮৭৬।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৫ মার্চ ১৮৭৬।

১১ ৬ জানুয়ারি ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১২ জানুয়ারি ১৮৮১।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
কলিকাতা	বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী (অস্থায়ী)	১৮৮১, ৪ সেপ্টেম্বর[১২]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক. ২য় শ্রেণী (অস্থায়ী)	১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি[১৩]
বারাসত	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৪ মে[১৪]
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ১৭ মে
জাজপুর (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮২, ৮ আগস্ট[১৫]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি[১৬]

ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ২০ নবেম্বর ১৮৮৩ হইতে ১৩ দিন[১৭]

	ঐ (১ম শ্রেণী)	১৮৮৪, ১ নবেম্বর[১৮]

১২ ১৬ আগষ্ট ১৮৮১।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৭ আগষ্ট ১৮৮১।

১৩ ২৩ জানুয়ারি ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২৫ জানুয়ারি ১৮৮২।

১৪ ২৯ এপ্রিল ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ৩ মে ১৮৮২।

১৫ ২৬ জুলাই ১৮৮২।—'ক্যালকাটা গেজেট', ২ আগষ্ট ১৮৮২।

১৬ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩।

১৭ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী হিসাব-বিভাগের ইতিহাস।

১৮ ৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪।—'ক্যালকাটা গেজেট', ৩১ ডিসেম্বর ১৮৮৪।

স্থান	স্থায়ী বা অস্থায়ী পদ	নিয়োগের তারিখ
ঝিনাদহ (যশোহর)	ডে. ম্যা. ও ডে. ক.	১৮৮৫, ১ জুলাই
ছুটি : অসুস্থতাবশতঃ ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ হইতে ৩ মাস		
ভদ্রক (কটক)	ঐ (অস্থায়ী)	১৮৮৬, ১৭ মে[১৯]
হাবড়া	ঐ	১৮৮৬, ১০ জুলাই[২০]
ছুটি : ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নবেম্বর ১৮৮৬ হইতে ৬ মাস		
মেদিনীপুর	ঐ	১৮৮৭, ১৯ মে[২১]
ছুটি : বিনা-বেতনে ২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ হইতে ৩ মাস ২০ দিন		
আলিপুর (২৪-পরগণা)	ঐ	১৮৮৮, ১৬ এপ্রিল[২২]
ছুটি : প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ হইতে ১ মাস ১৭ দিন		

অবসরগ্রহণ—১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

১৯ ১২ মে ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট', ১৯ মে ১৮৮৬। বালেশ্বরের জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন, "...from the old correspondence of the year 1886, it appears that Babu Bankim Chandra Chatterjee, Dy. Mag. and Dy. Collr. held charge of the Bhadrak subdivision temporarily from the 17th May to the 26th June 1886—for a period of 41 days only"

২০ ৫ জুন ১৮৮৬।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ৯ জুন ১৮৮৬।

২১ ১০ মে ১৮৮৭—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ মে ১৮৮৭।

২২ ১০ এপ্রিল ১৮৮৮।—'ক্যালকাটা গেজেট,' ১১ এপ্রিল ১৮৮৮।

সাহিত্য-জীবন

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার যে মুদ্রিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যায় যে, তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে (বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে সুরু করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (৫৫ বৎসর ৯ মাস) মৃত্যুর ঠিক এক মাস পূর্ব্বে লেখার কাজে বিরত হন; অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র পুরা ৪২ বৎসর বাণীর সেবা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন তাঁহার ছাত্র-জীবন হইতে আরম্ভ হইয়া, সমগ্র কর্ম্মজীবন অধিকার করিয়া শেষ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; তাঁহার সাহিত্য-জীবন স্বতন্ত্র অধ্যায়ের বিষয়ীভূত হইলেও এই কথাটা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনকে আমরা মোটামুটি চারিটি পর্ব্বে বিভক্ত করিতে পারি।

১। আদিপর্ব্ব: ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত ১৩ বৎসর।

২। উদ্যোগপর্ব্ব: ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত (বৈশাখ ১২৭৯ সাল) ৭ বৎসর।

৩। যুদ্ধপর্ব্ব: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' পত্রিকার বিদায়কাল পর্য্যন্ত ১৭ বৎসর।

৪। শান্তিপর্ব্ব: ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত ৫ বৎসর।

প্রথম দুই পর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্ব্বে সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্ব্বে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মত উপদেষ্টা।

আদিপর্ব্ব

এই পর্ব্বে গুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের ছাত্র। কলিকাতার সাহিত্য-সমাজে 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বড় প্রাধান্য; সাহিত্যযশোলোলুপ ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব। তাহারা তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া তখন গদ্য ও পদ্য মক্স করিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিখিতেছেন—

> বাঙ্গালা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।...দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী।

এই শিষ্যত্বের ফল 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ঋতুবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 'বিচিত্র' ও একটি 'বিষম বিচিত্র' নাটক এবং দুই-একটি টুকরা গদ্য-রচনা। 'ললিতা ও মানস' কাব্যও এই প্রভাবের ফল।

এই কালের রচনা হইতে ভবিষ্যৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা দুরূহ; পয়ারে বা ত্রিপদীতে ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থ অনুকরণ, রচনা স্থানে স্থানে অস্পষ্ট এবং স্থানে স্থানে স্পষ্টতঃ অশ্লীলতা-দোষদুষ্ট। যে প্রতিভা এক দিন সমগ্র বাংলা দেশকে বিস্মিত ও চমকিত করিয়াছিল, তাহার কোনও আভাস এগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে এক জন চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই ধরণের রচনা যে বিস্ময়কর,

তাহাতেও সন্দেহ নাই ; আর কিছু না থাকুক, এগুলিতে অকালপক্কতার নিদর্শন আছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত কাব্যচর্চ্চা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। উপন্যাসের মাঝে মাঝে তিনি দুই-একটি ছড়া অথবা সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথবা 'বঙ্গদর্শনে' ক্বচিৎ কখনও দুই-একটি গাথা অথবা ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন—পরবর্ত্তী কালে ছন্দোবদ্ধ কাব্যসরস্বতীর সহিত তাঁহার এই মাত্র সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যতি ও মিলের সংস্রব ত্যাগ করিলেও বঙ্কিমের কবিপ্রকৃতি কখনও স্বধর্ম্মচ্যুত হয় নাই ; তাঁহার উপন্যাস মাত্রেই কাব্যধর্ম্মী, তাঁহার গদ্য—গদ্যকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-মন বিশেষকে ত্যাগ করিয়া সামান্যকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার হাতে বাংলা-সাহিত্য এতখানি ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও কাব্য-জীবন ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে।

অতি শৈশব হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের বাণীপ্রকৃতি প্রকাশের যে সুযোগ খুঁজিতেছিল, ঈশ্বর গুপ্ত-প্রদর্শিত পথে এবং তাঁহার আদর্শে তাহা সার্থকতা লাভ না করিলেও নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ তখনই ঘটিয়াছিল ; সৃষ্টিরহস্যের সন্ধান পাইয়া ভিতরের আবেগ তখন পুষ্টিলাভ করিয়াছে। "ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল" সম্ভবতঃ "স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয়" হয় নাই, সেকালের শিক্ষিত সমাজের রুচি ও শিক্ষার মাপকাঠিতে ঈশ্বর গুপ্তের "রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত" ছিল না বলিয়াই "তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন।"* বঙ্কিমচন্দ্রও ভিন্ন পথে গমন করিয়া গুরুর ঋণ অস্বীকার করেন নাই। তিনি "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিতে" লিখিয়াছেন—

---

* বঙ্কিমচন্দ্র : 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'।

> প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান।… আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়।…আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার আদিপর্ব্বের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্ত ও তাঁহার অপর দুই শিষ্য—দীনবন্ধু ও দ্বারকানাথের নামও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই যুগের ইতিহাস সম্পূর্ণ জানিবার উপায় নাই; অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় ইহার কিছু পরিচয় আছে। শিষ্যেরা রচনা পাঠাইয়াছেন, গুরু উৎসাহসূচক টিপ্পনী-সহযোগে তাহা প্রকাশ করিতেছেন, কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন, এই রীতি এ যুগে আর দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উৎসাহ পাইয়াছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার্ সাহেব, রংপুরের তুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি পরগণার ভূস্বামী কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রকে নানা ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন, কিন্তু সকল উৎসাহের মূলে ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত; তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে, তিনিই বঙ্কিমচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গদ্য-রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আদিপর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাঁহার গদ্য ছিল অপাঠ্য, বিষম!

> যে লপনেন্দু শতং শশধর সঙ্কাশ শোভা পাইতেছে, সে বদন কর্দ্দম মণ্ডিত হওত মৃন্মণ্ডলে পতিত থাকিবেক, যে নয়নে অম্বুরেণু অসি অনুমান

> হয় বায়স বায়সী নখাঘাতে সে নয়নোৎপাটন করিবেক। যে রসনা প্রমদাধর রসনা পান করিয়া অন্য রস পান করে না, সে ওষ্ঠ নষ্ট হইয়া লোষ্ট্র ভক্ষণে কষ্ট পাইবেক।

'কপালকুণ্ডলা', 'কমলাকান্ত', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম'-লেখকের উপরোক্ত রচনা আজিকার দিনে আমাদের ভীতি ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্য-রচনা প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু বঙ্কিমের রচনা দৃষ্টে তিনিও শঙ্কিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—

> ইঁহার লিপিনৈপুণ্য জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু যেন অভিধানের উপর অধিক নির্ভর না করেন…।
>
> [বঙ্কিম]…রচনায় আর সমুদয় বঙ্কিম করুন, তাহা যশের জন্যই হইবে, কিন্তু ভাবগুলীন্ প্রকাশার্থ যেন বঙ্কিমভাষা ব্যবহার না করেন…।

বঙ্কিমের এই জাতীয় গদ্য ও পদ্য রচনা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সম্ভবতঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' নামক কাব্যগ্রন্থখানিও ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের রচনা।

ছাত্র-জীবনে বঙ্কিমের উপর দীনবন্ধুরও কিছু প্রভাব ছিল। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত "মানব-চরিত্র" শীর্ষক দীনবন্ধুর একটি কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জনখানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি।—'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী'।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ তখনও 'প্রভাকরে' লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। দীনবন্ধুর রচনা তাঁহাকে কাব্যরচনায় উৎসাহিত করিয়া থাকিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইলেও ইহার মুদ্রণকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন নাই। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বঙ্গবাণী-সেবার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একটু অধিক পরিমাণ ইংরেজীনবিশ হইয়া থাকিবেন; কলেজে ইংরেজীতে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল, সংস্কৃত-কাব্য ও ইউরোপীয় ইতিহাস তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং এই কালে যে তিনি ইংরেজী রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে *Indian Field* নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife*-এ পাই। 'ললিতা ও মানসে'ও তাঁহার ইংরেজীনবিশির যথেষ্ট পরিচয় আছে। পরবর্ত্তী কালে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের নিকট বলিয়াছিলেন, "বরাবর বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরেজী লেখা ও বলা তাঁর পক্ষে অধিক সহজসাধ্য" ('সাধনা,' শ্রাবণ, ১৩০১)।

১৮৫৩ হইতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনার একটিমাত্র পৃষ্ঠার সমসাময়িক মুদ্রিত নিদর্শন আছে—তাহা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ললিতা ও মানসে'র বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা, গদ্যে লিখিত। এ গদ্যও ভয়াবহ। 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি স্বরচিত ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদ স্বয়ং সুরু করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মৃত্যুর ২৫ বৎসর পরে শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'বারিবাহিনী' নামক উপন্যাসে যুক্ত হইয়াছে। এই অনুবাদের কথা পরে আলোচিত হইতেছে।

'ললিতা ও মানসে'র "বিজ্ঞাপন"টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে বলিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল।—

> সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতা দ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্ত্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।
>
> তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাসজনিত এই কাব্য দ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বকর্ম্মার্জ্জিত ফলভোগে অস্বীকার নহেন কিন্তু অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সের অজ্ঞতা ও অবিবেচনা জনিত তাবৎ লিপিদোষের এক্ষণে দণ্ড লইতে প্রস্তুত নহেন।
>
> গ্রন্থকার।

এই রচনাটি লইয়া অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

> অতি অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি কবিতার রস উপভোগ করিতে পারিতেন। এই সময় হইতেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরাজি সাহিত্যে তিনি অধিকতর প্রবেশ লাভ করেন।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১২৭, ১৩১।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের নিতান্ত দুরবস্থা ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছেন—

> ১৮৫৬ সালের বঙ্কিমবাবুর বিজ্ঞাপন-পাঠে মনে হয়, এই গদ্য-সম্পৎ বঙ্কিমবাবু একান্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন।···সমস্ত লেখাটী পড়িলেই মনে হয়, সাগরী যুগের রঙ্গ এই লেখায় একটুও প্রতিফলিত হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব গদ্যের প্রসাদগুণের প্রভাব এই বিজ্ঞাপনে প্রকাশ পায় নাই। মনে হয়, গ্রন্থকার সেই গদ্যের প্রভাব তখন অনুভব করেন নাই—প্রত্যুত সেই গদ্য একান্ত উপেক্ষাই করিয়াছেন।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১২৭, ১৩১।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার যাবতীয় নিদর্শন তাঁহার 'ললিতা ও মানস' পুস্তকে ও 'সংবাদ প্রভাকরে'র পৃষ্ঠায় রক্ষিত আছে। 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কয়েকটি গদ্য ও পদ্য রচনা শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী'তে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, বাকি যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা 'বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী'র "বিবিধ" খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিমের বাল্যশিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, শৈশবে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার মিঃ টীড্ ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ মলেটের গৃহে খুব বেশী যাতায়াত করিতেন; টীড্-পত্নী ও মলেট-পত্নী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং আপন আপন ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহার সহিত প্রায়ই গল্পগুজব করিতেন। ইহার ফলে তাঁহার ইংরেজী শিক্ষার ভিত্তিপত্তন একটু দৃঢ় ভাবেই হইয়া থাকিবে। তাহার পর হুগলী কলেজে ইংরেজী লিখনে ও পঠনে বঙ্কিমচন্দ্র এত দূর দক্ষ হইয়াছিলেন যে, পঠদ্দশাতেই বাংলার চর্চ্চা ছাড়িয়া দেন। এই অবস্থায় তাঁহার মনোবৃত্তি কিরূপ ছিল, তিনি স্বয়ং পরবর্ত্তী কালে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে) বেঙ্গল সোশ্যাল

সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে প্রদত্ত "A Popular Literature for Bengal" বক্তৃতায় বর্ণনা করেন—

> আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন।...যে তীব্র বুদ্ধি, তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজী ভাষায় কথা কহিতে ও লিখিতে পারে, সে মনে করে, বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীনবৃত্তি-মাত্র,...।*

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বেনামী প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন—

> অর্দ্ধ-শিক্ষিত ক্ষিপ্র লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্য্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে, এবং ইঁহারা মাতৃ-ভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন।†

বঙ্কিমচন্দ্রের এই যুগের ইংরেজী রচনা যে আমাদের কাল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তাহাও নহে। 'বঙ্কিম-জীবনী'-লেখক *Adventures of a Young Hindu*-র উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ১০৮), কিন্তু তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারেন নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রী 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গসমাজ' পুস্তকে বঙ্কিমের কাব্যচর্চ্চা ত্যাগের একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

> সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া পদ্যরচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মধুসূদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সে পথ তাঁহাকে

---

* পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ: 'সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২০, পৃ. ৯৮-৯৯।

† শ্রীমন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদ: 'বাঙ্গালা সাহিত্য', পৃ. ১৫।

পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গদ্যরচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন। অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।—২য় সং, পৃ. ২৫২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, সপ্তম অধিবেশনের (কলিকাতা, ১৩২০ বঙ্গাব্দ) অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার অভিভাষণে বঙ্কিমের এই যুগের সাধনার কথা কিছু উল্লেখ করিয়াছেন—

বঙ্কিমবাবু ইতিহাস ও নবেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তখন ভারতবর্ষের ইতিহাস ছিল না ও হয়ও নাই। বঙ্কিমবাবু ইউরোপের ইতিহাস খুব ভাল জানিতেন। ভারতবর্ষের মুসলমান ও ইংরাজ অধিকারে যে সকল ইতিহাস ছিল, তাহা সমস্তই তিনি পড়িয়াছিলেন। কলেজে তিনি সংস্কৃত পড়েন নাই। টোলে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অনেকগুলি পড়িয়াছিলেন। তিনি যখন স্কুলে পড়েন, তখন ঈশ্বর গুপ্তের খুব প্রভাব। তাঁহার সংবাদ প্রভাকর সকলেই পড়িতেন। বঙ্কিমবাবু, দীনবন্ধুবাবু ও জগদীশ তর্কালঙ্কার এই তিন জন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট বাঙ্গালা লেখার শিক্ষানবিশী করিতেন। এই শিক্ষানবিশীতে পরিপক্ক হইয়া বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা নবেল লিখিতে আরম্ভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার ছাত্র-জীবন ; এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পড়াশুনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয়। যশোহরে গিয়াই দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার নব আসক্তির মূলে এই

ঘনিষ্ঠতা কতখানি কাজ করিয়াছে, আজ তাহা আমরা আন্দাজ মাত্র করিতে পারি ; কিন্তু যশোহর হইতে নেগুয়াঁ হইয়া খুলনায় আসা পর্য্যন্ত তাহার কোনই পরিচয় পাই না। খুলনায় তিনি *Rajmohan's Wife* রচনা করেন ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পর্য্যন্ত যে তাঁহার ঝোঁক ছিল, তাহার প্রমাণ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট হইতে তাঁহাকে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভুক্ত হইতে দেখি ; মধুসূদন-বন্ধু গৌরদাস বসাক ঐ বৎসরের ১লা জুলাই তারিখে তাঁহার নাম প্রস্তাবিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সভ্যরূপে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

খুলনা হইতেই অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশ-নন্দিনী'-রচনায় হাত দেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভবিষ্যৎ বঙ্কিমের সূচনা দেখা দিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয় নাই, *Rajmohan's Wife* রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়া থাকিবে। কল্পনা তখনও দিগন্তবিস্তারী নয়, মূলধনও কম—বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ নিজেই নিজের ইংরেজী উপন্যাসের অনুবাদ করিতে বসিলেন। এক অধ্যায়, দুই অধ্যায়, তিন অধ্যায়—অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে কোনও কিছুর পুনরাবৃত্তি সুখপ্রদ ও সহজসাধ্য নয়। অনুবাদ অগ্রসর হইল না। 'রাজমোহনের স্ত্রী' সূত্রপাতেই বিনষ্ট হইল।

কিন্তু পাতা কয়টা রহিয়া গেল—সন্দিগ্ধ ব্রীড়াবনতা প্রতিভার প্রথম লজ্জারুণ বিকাশ! একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই কয়েকটি পৃষ্ঠায় লক্ষণীয়। 'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল, 'রাজমোহনের স্ত্রী' লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্ম্মম ভাবে

ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। টেকচাঁদ ঠাকুর—প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'আলালের ঘরের দুলাল' তখন তিনি দেখিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে নিজেই বলিয়াছেন—

> "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।...উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থরচনা করা যায়,...। এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।—"বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান।"

এই "বাঙ্গালি লেখক" বঙ্কিমচন্দ্র নিজে। বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যাসাগরী রীতি ('কাদম্বরী' ইহার চরম) এবং আলালী রীতির সমন্বয় সাধন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন। *Rajmohan's Wife*-এর অনুবাদটুকু এই অপূর্ব্ব সমন্বয়-চেষ্টার প্রথম নিদর্শন হিসাবে বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান্।

কিন্তু অভ্যাস তখনও প্রবল। অভ্যাসবশে পুরাতন রীতি আত্ম-প্রকাশ করিতেছে এবং নূতন রীতি তখনও রপ্ত হয় নাই বলিয়া অনুকরণের দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে। এই দ্বন্দ্ব দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো সহজ।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রমণীকুসুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক। তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোদুঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্দ্ধ প্রোজ্জ্বল, অর্দ্ধশুষ্ক হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল; অতি বর্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রন্থিতে স্কন্ধদেশে বদ্ধ ছিল; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দ্দোষ বঙ্কিম ভ্রূযুগল ব্রীড়াবিকম্পিত; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত; কিন্তু যখন সে পল্লব উদ্ধোত্থিত হইয়া কটাক্ষস্ফুরণ করিত, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনীপ্রভা প্রকটিত হইল। —'বারিবাহিনী', পৃ. ৪।

মাধব হাসিয়া কহিল, "শুধু এ সকল সুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছি না, আমার কাজও আছে।"

মথুর। কাজ ত সব জানি।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক্ বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজিনবিশ ইয়ার বক্‌শকে মদ খাওয়ান—আর হয়ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল্। হাঁ করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ? তুমি কি কখন কন্‌কিকে দেখ নাই? না ওই সঙ্গের ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে?—তাইত বটে!—'বারিবাহিনী', পৃ. ৯।

প্রাচীন ও নবীন রীতির এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের আদিপর্ব্বের সমাপ্তি এবং ভবিষ্যৎ বঙ্কিম-প্রতিভার স্ফুরণ। 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা অগ্রসর হইতেছে। আয়োজন এবং উপকরণ সম্পূর্ণ ছিল; ইংরেজী সাহিত্য ইতিহাস ও ভাষায় অসামান্য দখল, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকার, বিদ্যাসাগর ও টেকচাঁদের আদর্শ।

যুগাবতারের প্রতিভাস্পর্শে যে সৌধের ভিত্তিপত্তন হইল, সমগ্র বাঙালী জাতিকে যে তাহা এক দিন আশ্রয় দিবে, সেই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে কে তাহা কল্পনা করিতে পারিয়াছিল ?

উদ্যোগপর্ব্ব

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট।

> ৯৯৮ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে এক দিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেননা সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি যদি কালধর্ম্মে প্রদোষ কালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্য্যাস্ত হইল, ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্বচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।—'দুর্গেশনন্দিনী', ১ম সং. (১৮৬৫), পৃ. ১।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের দিগন্ত-সংস্থিত ঘোরতর অন্ধকারে স্বীয় প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে বঙ্কিমচন্দ্র পথ চলিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস সর্ব্বজনবিদিত এবং বহু রসিক ও গুণী সমালোচক বহু পুস্তক ও পুস্তিকায় এবং সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ আজিও হয় নাই। এই বহু-আলোচিত ইতিহাসের বিস্তারিত পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা

এই ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবার জন্য অতঃপর প্রধান প্রধান ঘটনা এবং বঙ্কিমের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবন গঠনে যে সকল আলোচনা সহায়তা করিয়াছিল, সেগুলির উল্লেখ মাত্র করিব। যে-সকল আলোচনা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য, প্রয়োজনমত সেগুলি অংশতঃ উদ্ধৃত করিব।

শচীশচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার যে ইতিবৃত্ত দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, ইহা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমের ২৪ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার খুলনায় অবস্থানকালে শেষ হয়। পুস্তকের গুণাগুণ নিজে ঠাহর করিতে না পারিয়া তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে পাণ্ডুলিপি পড়িতে দেন। তাঁহারা পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করাতে "বঙ্কিমচন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে প্রস্থান" করেন।*

১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'প্রদীপে' বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের সহকর্ম্মী কালীনাথ দত্ত-লিখিত "বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক স্মৃতি-কথা পাঠে বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে আসিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে বদলি হন। সুতরাং শচীশবাবুর উক্তি ঠিক নহে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র 'আইভ্যানহো'-সম্পর্কিত একটা অপবাদ বরাবর আছে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও কালীনাথ দত্তের নিকট বলিয়াছিলেন, 'দুর্গেশনন্দিনী'-রচনার পূর্ব্বে তিনি 'আইভ্যানহো' পড়েন নাই। কালীনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "আমি তাঁহার honesty unimpeachable বলিয়া বিশ্বাস করি।"† শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

---

* 'বঙ্কিম-জীবনী', ৩য় সং, পৃ. ২৬১। † কালীনাথ দত্ত : 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ২১৫।

তৎপ্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তকের ৬৭-৭৯ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্কটের পুস্তকের সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য থাকিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা।

সমসাময়িক সমালোচক-মহলে 'দুর্গেশনন্দিনী' লইয়া দুই পরস্পর-বিরোধী মত প্রচারিত হইয়াছিল। কাহারও মতে 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের একটি নিকৃষ্ট রচনা; কেহ কেহ ইহাকে শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম বলিয়াছেন।

উদ্যোগপর্ব্বের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনারীতি লইয়া পণ্ডিতসমাজ আক্রমণ চালাইয়াছিলেন, কিন্তু এই আক্রমণ সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রীতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কারণ, তিনি অন্তরে অন্তরে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, ভাষা লইয়া তিনি যাহা করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব; পুরাতনপন্থীদের তাহা হজম করা শক্ত, কিন্তু বাংলা ভাষাকে অত্যুৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাহন করিয়া তুলিতে হইলে এই অভিনবত্ব একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সে যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীরা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশেই বাংলা-সাহিত্যের নূতন বিপুল সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই হঠাৎ-চমক ও আনন্দ-কলরবের কথা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত বাঙালী রমেশচন্দ্র দত্ত এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন:—

> যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটী নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে বালার্ককিরণে প্রফুল্ল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্তুতিগান করিল। কলিকাতা ও ঢাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্ব্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল, বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে

> একটী নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটী নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।—'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', শ্রাবণ, ১৩০১, পৃ. ৪।

এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র পর পর অত্যল্প কালের মধ্যে আরও দুইটি উপন্যাস রচনা করেন; 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং 'মৃণালিনী' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিন বৎসরের ব্যবধানে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে যদিও বা সন্দেহ ছিল, 'কপালকুণ্ডলা'তে সকল সন্দেহের নিরসন হইল, বঙ্কিমচন্দ্র অবিসম্বাদিতরূপে বাংলা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া স্বীকৃত ও সম্মানিত হইলেন। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীয় প্রতিভা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের দ্বিধাও সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল এবং বাংলা-সাহিত্যের বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধপর্ব্ব

শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, বঙ্কিমচন্দ্র শিশু বাংলা-গদ্যের সকল বিভাগেই হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। উপকরণ সবই ছিল, উপকরণের যথাযথ প্রয়োগে যুগাবতার বঙ্কিমচন্দ্র বাণীমন্দিরে মাতৃভাষার এমন একটা মোহিনী মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন যে, নিতান্ত বিমুখ ও অত্যন্ত অলস ব্যক্তিকেও একবার কৌতুক ও কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিতে হইল। এক মুহূর্ত্তে বিপুল সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিল। বাংলা দেশে 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইল।

> …বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্ঘাটিত হইল।

পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য !...বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ।" এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত মাসিকপত্র কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।—রবীন্দ্রনাথ : 'আধুনিক সাহিত্য', ২য় সং, পৃ. ২।

'মৃণালিনী' প্রকাশের মাসাধিক কালের মধ্যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। বঙ্কিম-জীবনের বহরমপুরের এই কয়েক বৎসর বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। বহুদিন হইতেই বঙ্কিম-চন্দ্রের বাসনা ছিল, একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিবেন। যোগাযোগের অভাবে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুরের ১ নং পিপুলপটী লেন হইতে সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে ব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল। বহরমপুরে তখন রীতিমত সাহিত্যের আসর—সাহিত্য-চর্চ্চার যেন বান ডাকিয়াছিল। ভূদেব, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন,

তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন উকীল),—এই সুধী এবং সাহিত্য-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র যোগদান করিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল। যে সৌরমণ্ডলী বঙ্কিম-সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া দীর্ঘকাল বাংলার সাহিত্যাকাশে প্রদীপ্ত প্রভায় বিরাজ করিয়াছিলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র সহায়তায় তাঁহারা ধীরে ধীরে ভাস্বর হইয়া উঠিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই একটু স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী, রাশভারি প্রকৃতির লোক ছিলেন, আপন স্বভাব-সুলভ গাম্ভীর্য্য লইয়া জনতা হইতে ত দূরে থাকিতেনই, সাহিত্যিক মজলিশেও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিতেন। এই কারণে দাম্ভিক বলিয়া তিনি নিন্দাভাজনও হইয়াছেন। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন'-প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া উঠিলেন; নিজে সব্যসাচীর মত লেখনী প্রয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন না, গোষ্ঠীপতিরূপে নির্ব্বাচিত লেখকদের দিয়া আপন ফরমাশ অনুযায়ী প্রবন্ধ গল্প প্রভৃতি লেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার এই সাহিত্যিক উন্মাদনার আভাস "বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা"তে আছে। এই সময়ে এই বহরমপুরেই বঙ্কিমের প্রভাবে পড়িয়া সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র বাংলা লিখিতে প্রতিশ্রুত হন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতিও বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণেই বঙ্গবাণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; পরবর্ত্তী কালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কেও তিনি সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত করেন।

"বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা"য় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

> এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল,

এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ-মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি সেদিন সুকৌশলী সেনাপতির মত বঙ্গবাণীর বিচ্ছিন্ন সেবকদের 'বঙ্গদর্শনে'র ব্যূহমধ্যে সংস্থাপিত করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে অত্যল্পকাল মধ্যে বঙ্গসাহিত্যের এতখানি প্রসার সম্ভব হইত না। তিনি নিজে পুরোভাগে থাকিয়া এক দিকে প্রাচ্য জড়তা ও অন্য দিকে অস্বাস্থ্যকর-মোহজাত পাশ্চাত্যের অনুকরণবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঙালী-জাতি এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র "সূচনা" হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রচারে'র "বিদায়" পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্কিমচন্দ্রের রণোন্মাদের কাল।

'বঙ্গদর্শনে' পর পর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা' (ছোট), 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাহিত্যিক বিবিধ বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধও তিনি প্রকাশ করিতে থাকেন। শেষোক্ত প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলিকে বঙ্কিম যুদ্ধকালীন আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন; এইগুলির সাহায্যে তাঁহার আদর্শ-নিষ্ঠাও প্রতি দিন বাঙালী পাঠক-সমাজে প্রকট হইত।

আবর্জ্জনা-দূর ও আদর্শ-প্রতিষ্ঠার কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহার বহুবিষয়িণী ও নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা থাকা প্রয়োজন। বক্তব্য একঘেয়ে হইলে অবজ্ঞাত হইবার আশঙ্কা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই প্রতিভা ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতেই তিনি ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সঙ্গীত, সাহিত্য-সমালোচনা ও ব্যঙ্গকৌতুক স্বয়ং লিখিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন; মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া

বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকেও বাদ দিতে পারেন নাই। স্বীয় স্বভাবধর্ম্মে পলিটিক্‌স্‌কে বাদ দিয়া চলিলেও তিনি যে একান্তভাবে তাহা বর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয় 'সাম্যে' আছে।

বহরমপুরে অবস্থানকালেই (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। উদ্যোগ-পর্ব্বের রোমান্স ও ঐতিহাসিক রোমান্সে যে কাজ হয় নাই, এই সামাজিক উপন্যাস দুইটির প্রকাশে সে কাজ সহজেই সাধিত হইল। বাংলা দেশের সাধারণ বাঙালীর বর্ত্তমান দৈনন্দিন জীবন যে উপন্যাসের বিষয় হইতে পারে, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতি সেদিন পুলকবিহ্বল হইয়াছিল। শিক্ষিত সমাজ যে বাংলা-সাহিত্যকে ঘৃণায় বর্জ্জন করিয়া চলিতেন, সেই শিক্ষিত সমাজই বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া আশ্বস্ত ও প্রলুব্ধ হইয়া উঠিলেন; বাংলা-সাহিত্য পশ্চাতের খিড়কিদ্বার হইতে একেবারে সদরে সমারোহের সহিত উন্নীত হইল।

> ...বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরাজি পণ্ডিতেরা বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্ত্তি উপার্জ্জন করা যাইতে পারে সে-কথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল।...অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত।...
>
> এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সঙ্কুচিতা বঙ্গ-ভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কি যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।
>
> তখন তাঁহার অপেক্ষা অনেক অল্পশিক্ষিত প্রতিভাহীন ব্যক্তি ইংরেজিতে দুই ছত্র লিখিয়া অভিমানে স্ফীত হইয়া উঠিতেন। ইংরেজি

সমুদ্রে তাঁহারা যে কাঠবিড়ালীর মত বালির বাঁধ নির্ম্মাণ করিতেছেন সেটুকু বুঝিবার শক্তিও তাঁহাদের ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে সেই অভিমান সেই খ্যাতির সম্ভাবনা অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়ে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন ইহা অপেক্ষা বীরত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে?...

কেবল তাহাই নহে। তিনি আপনার শিক্ষাগর্ব্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যত কিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধন রত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিত-ভাবে বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্ব্বে সেই অনাদর-মলিন ভাষার মুখে সহসা অপূর্ব্ব লক্ষ্মীশ্রী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

বঙ্কিম যে গুরুতর ভার লইয়াছিলেন তাহা অন্য কাহারও পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। প্রথমত, তখন বঙ্গভাষা যে অবস্থায় ছিল তাহাকে যে শিক্ষিত ব্যক্তির সকলপ্রকার ভাবপ্রকাশে নিযুক্ত করা যাইতে পারে ইহা বিশ্বাস ও আবিষ্কার করা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য। দ্বিতীয়ত, যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোনো আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভালো লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম্ম।...সর্ব্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং

সে-শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্ব লোকের দ্বারাই সম্ভব।…

বঙ্কিম নিজে বঙ্গভাষাকে যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন অন্যেও তাহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন। পূর্ব্ব অভ্যাস-বশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্দ্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

…সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্য্যে এক হস্ত নিবারণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।

রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্য্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গসাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

…মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।…কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না, সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে তিনি অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন। এই জন্য চিরকাল তিনি অম্লানমুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন। কোনোদিন তাঁহাকে রথবেগ খর্ব্ব করিতে হয় নাই।

…বঙ্কিম সাহিত্যে কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্য্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্ব্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া

ধাবমান হইতেন।…বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্ত্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেইখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল অভয় দিতেন, সান্ত্বনা দিতেন, অভাব পূর্ণ করিতেন, তাহা নহে, তিনি দর্পহারীও ছিলেন! এখন যাঁহারা বঙ্গ-সাহিত্যের সারথ্য স্বীকার করিতে চান তাঁহারা দিনে নিশীথে বঙ্গদেশকে অত্যুক্তিপূর্ণ স্তুতিবাক্যে নিয়ত প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল।…সাহিত্যমহারথী বঙ্কিম, দক্ষিণে বামে উভয় পক্ষের প্রতিই তীক্ষ্ণ শরচালন করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার নিজের প্রতিভা কেবল তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল। তিনি যাহা বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন—বাক্‌চাতুরী দ্বারা আপনাকে বা অন্যকে বঞ্চনা করেন নাই।—রবীন্দ্রনাথ : 'আধুনিক-সাহিত্য'।

এই সব্যসাচী, দণ্ডবিধাতা, কর্ম্মযোগী, খড়্গধারী, দর্পহারী, মহারথী, বীরশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র সেই মহাদুর্য্যোগের কালে দৃঢ়হস্তে বঙ্গসাহিত্য-তরণীর কর্ণধার হইয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বানচাল হয় নাই, তাঁহার আবির্ভাবের শতাব্দীপাদের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবও সম্ভব হইয়াছে।

প্রথমে এই পর্ব্বের প্রবন্ধগুলির কথাই বলি। 'বিজ্ঞানরহস্য' ও 'সাম্যে'র উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি—বঙ্কিমচন্দ্রের বহু কীর্ত্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্যই এগুলি সম্ভব হইয়াছিল। সুতরাং 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, বাংলা-সাহিত্যের পরবর্ত্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন বাংলায় নূতন কাব্যধারার প্রবর্ত্তন করিয়া

সার্থক হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেমন বাংলার কথাসাহিত্যকে সঞ্জীবিত ও পল্লবিত করিয়া সার্থক হইয়াছিল, 'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাবের সার্থকতা তেমনই বাংলার প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের অভিনব বিকাশ ও বিস্তারের মধ্যে। বস্তুতঃ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সর্ব্বশুভকরী', 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ', 'সোমপ্রকাশ' ও 'রহস্য-সন্দর্ভ' প্রভৃতিতে যে সম্ভাবনার আংশিক আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। প্রবন্ধ-সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক জোগাইতে পারে, 'বঙ্গদর্শনে'ই সেই সত্য সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হইল।

অবশ্য ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্বই পনর আনা; তাঁহারই আদর্শ, উদ্দীপনা ও উপদেশে জগদীশনাথ রায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্যামদাস সেন প্রভৃতি স্বনামধন্য পণ্ডিতেরা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নব নব উদ্ভাবনী প্রতিভা গতানুগতিকতা ও একঘেয়েমির হাত হইতে প্রবন্ধ ও সমালোচনা-সাহিত্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, অর্থনীতি, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব—এমন কোনও বিষয় নাই যাহাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই, এবং যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন তাহাই সাহিত্য হইয়াছে। বাংলায় যে প্রবন্ধ-সাহিত্য ও সমালোচনা-সাহিত্যের আমরা আজ গৌরব করি, তাহা একা বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। তাঁহার এই সৃষ্টিকাল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কুড়ি বৎসর বিস্তৃত এবং এগুলি

'বঙ্গদর্শন', 'ভ্রমর', 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করে। এই যুগের প্রারম্ভে ও শেষে প্রধানতঃ 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ও "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীতেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' চারি বৎসরকাল প্রকাশিত হইয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বন্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বেই তিনি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রঙ্গরহস্যমূলক প্রবন্ধগুলি ও বিজ্ঞানবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'বিজ্ঞানরহস্য' নাম দিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইবার পরেই তিনি সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নয়টি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' নামে কাঁটালপাড়া, বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হয়। তখনও অনেক প্রবন্ধ অবশিষ্ট থাকে। তাহারও দশটি লইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাঁটালপাড়া হইতেই 'প্রবন্ধ পুস্তক' প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র নূতন নূতন প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ('বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় পর্য্যায় তখন বন্ধ হইয়াছে, 'প্রচার' ও 'নবজীবন' চলিতেছে) বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ সমালোচন' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' বাতিল করিয়া উভয় পুস্তকের প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া ও দুই-একটি বর্জ্জন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ' প্রকাশ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে 'বঙ্গদর্শনে' নূতন লিখিত এবং 'প্রচারে' প্রচারিত প্রবন্ধগুলি নিতান্ত এলোমেলো ভাবে সাজাইয়া প্রায় বিনা সম্পাদনায় 'বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমের যে সকল মূল্যবান্

প্রবন্ধ এত দিন পর্য্যন্তও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ছিল, পরিষৎ-সংস্করণ-গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে সেগুলির অধিকাংশ স্থান পাইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠে যোদ্ধা বঙ্কিমের একটা রূপ পাঠকের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠে; সে রূপ শুধু স্রষ্টার নয়—পালকেরও।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 'লোকরহস্য', ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পরে (১২৯২ বঙ্গাব্দে) পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কমলাকান্ত' নামে বাহির হয়। 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য' ও 'বিবিধ প্রবন্ধে' এবং পরবর্ত্তী জীবনের অনুশীলন-তত্ত্বমূলক রচনাবলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের যে দিক্‌টির পরিচয় পাই, তাহাকে তাঁহার গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ গম্ভীর দিক্ বলা যায়। 'বঙ্গদর্শনে'র সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এবং প্রধানতঃ বৈচিত্র্য সম্পাদনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গীতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘু দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই, বিদ্রূপের আবরণে সে-সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ বাংলা-সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।

'কমলাকান্ত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্রতম সৃষ্টি; বস্তুতঃ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র

তাঁহার কমলাকান্ত-চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছেন। কমলাকান্ত বলিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকেই বুঝিয়া থাকি। কমলাকান্ত আইডিয়ালিস্ট—আদর্শবাদী এবং বাস্তবের ঊর্দ্ধলোকে তাহার কল্পনা-বিহার। কমলাকান্ত কবি, প্রেমিক এবং বাংলা-সাহিত্যের যাহা প্রথম—স্বদেশপ্রেমিক।

গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্যে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন তাঁহার ছিল না। প্রবহমান সংসার-স্রোতের উপরিভাগে আপাতমনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনও কখনও গভীর রহস্যগহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের ও বিশেষ করিয়া যে-সকল হতভাগ্য জীব তাঁহার আশে পাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান, তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হালকা হাসির বুদ্বুদ-বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্দ্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে-সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিক্স, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত-জন্মের ইহাই ইতিহাস। কমলাকান্তের দর্শনকে অর্থসঙ্গতি দেওয়ার জন্য নসীরামবাবু ও প্রসন্ন গোয়ালিনী

এবং পৃথিবীতে প্রচারের জন্য ভীষ্মদেব খোশনবীসকেও সৃষ্টি করিতে হইল।

'আনন্দমঠে'র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনী'তে যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী-জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাতৃপূজার মন্ত্র শিখাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম আমাদের জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদিগকে সচেতন করিয়াছেন এই 'কমলাকান্তে'। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।

বর্ত্তমান জগৎ, সুতরাং বাংলা দেশও অধুনা ভোগসুখলোলুপতায় উন্মাদের মত যে লেলিহান বাসনাবহ্নির ইন্ধন জোগাইবার জন্য ছুটিতেছে, এবং যে সোশ্যালিজ্‌মের প্রচণ্ড আঘাতে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান প্রায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল, ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেই 'কমলাকান্ত' তাহারও দুঃস্বপ্ন দেখিয়া "পতঙ্গে" ও "বিড়ালে" যে মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিল, আজও তাহা পুরাতন হইয়া যায় নাই—কমলাকান্তের মনের এই চিরসঞ্জীবতা ও নবীনতা বিস্ময়কর। অদ্ভুত প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে কোনও সাহিত্যস্রষ্টা কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আসিতে পারেন না; বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তে' যে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ ও কালের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তিনি অনাগত ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং বহিঃপৃথিবীর প্রচণ্ড সংঘাত আশঙ্কা করিয়া বাঙালীকে স্বদেশের স্বল্পপরিসর মৃত্তিকায় সচেতন ও আত্মস্থ হইয়া দাঁড়াইবার যে ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন, তাহা দিয়াই আমরা তাঁহার প্রতিভার বিরাট্‌ত্বের

বিচার করিব। শাশ্বত শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার যুগে একক ছিলেন, তাঁহার সকল দেশপ্রেম ও স্বজাতিকতাকে ছাপাইয়া তাঁহার সেই নিঃসঙ্গ মনের আর্ত্তনাদ আমরা আজও শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতেছি।

এইবার উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে মোট এগারখানি ক্ষুদ্রবৃহৎ উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকাকারে প্রকাশ-কালের ক্রম ধরিয়া সেগুলি এই :—১। বিষবৃক্ষ—১৮৭৩, ২। ইন্দিরা (ছোট)—১৮৭৩, ৩। যুগলাঙ্গুরীয়—১৮৭৪, ৪। চন্দ্রশেখর—১৮৭৫, ৫। রাধারাণী—১৮৭৫, ৬। রজনী—১৮৭৭, ৭। কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮৭৮, ৮। রাজসিংহ (ছোট)—১৮৮২, ৯। আনন্দমঠ—১৮৮২, ১০। দেবী চৌধুরাণী—১৮৮৪, এবং ১১। সীতারাম—১৮৮৭। পরিবর্দ্ধিত 'ইন্দিরা' (১৮৯৩) ও 'রাজসিংহ' (১৮৯৩) স্বতন্ত্র উপন্যাস বলিয়া ধরিলে এই যুগে মোট উপন্যাসের সংখ্যা তের। এই তেরখানি উপন্যাসকে দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা যায়। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনখানি এক পর্য্যায়ে পড়ে ; বাকী দশখানি (দুই 'ইন্দিরা', দুই 'রাজসিংহ') অপর পর্য্যায়ভুক্ত। শেষোক্ত পয্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিছক কবি এবং শিল্পী ; প্রথম পর্য্যায়ে তিনি কবি এবং শিল্পী ছাড়াও জাতিগঠন-প্রয়াসী প্রচারক। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাসগুলি লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে এবং বহু সমালোচক এই আলোচনাগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা আলোচনা ও বাদানুবাদ পরিহার করিয়া সংক্ষেপে এই উপন্যাসগুলির রচনার ধারাবাহিক ইতিহাস মাত্র বর্ণনা করিব।

উদ্যোগপর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র তিনখানি ঐতিহাসিক রোমান্সধর্ম্মী উপন্যাস লিখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বাংলা দেশকে সম্পূর্ণ জয় করিতে হইলে

সমসাময়িক সমাজ-সমস্যাকে এড়াইয়া গেলে চলিবে না। এই কারণে যুদ্ধপর্ব্বে অন্যান্য আয়োজনের সঙ্গে সে যুগের বাঙালী-সমাজের যে দুইটি বৃহত্তম সমস্যা—বিধবাবিবাহ এবং বহুবিবাহ, তাহা লইয়াই তিনি উপন্যাস রচনা করিতে বসিলেন। যুদ্ধপর্ব্বের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষে'র ইহাই গোড়াপত্তন। 'বিষবৃক্ষে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রার্থিত ফল ফলিয়াছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ইহার ধারাবাহিক প্রকাশ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার প্রতি দীর্ঘ দিনের অবহেলা বিস্মৃত হইয়া এই অপূর্ব্ব চমকপ্রদ কাহিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এক 'বিষবৃক্ষে'র দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের মনের গোপন উদ্দেশ্য প্রভূত পরিমাণে সাধিত হইল। 'বিষবৃক্ষ' প্রকাশের পর বাংলার শিক্ষিত মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল, সমসাময়িক সমালোচনায় তাহার পরিচয় আছে। সুবিখ্যাত 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের সমালোচক লিখিয়াছিলেন :—

> This novel....was to be found in the *baitakhana* of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors. While the others were all historical, "men and women as they are, and life as it is," is the motto of the present one.—*The Calcutta Review*, No. cxiv, Critical Notices, pp. v-vi.

উদ্যোগপর্ব্বের এবং যুদ্ধপর্ব্বের 'বিষবৃক্ষ'-পর্য্যায়ের উপন্যাসগুলির পার্থক্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কালে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন—

> বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে

দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজীতে যাকে বলে রোম্যান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। ...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।—'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩৩৮, পৃ. ৮০৬-৭।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র যতগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকটি নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস অথবা রোমান্স পর্য্যায়ে পড়িলেও, ইহাদের প্রত্যেকটি আসলে এই অভিজ্ঞতামূলক বাস্তবতাধর্ম্মী। তিনি প্রয়োজন মত কল্পনাকে অবাধ বিস্তার দান করিবার জন্য অতীত পরিবেশের সাহায্য লইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাচীন পরিবেশের মধ্যেও বঙ্কিমের সমসাময়িক সমাজকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। 'ইন্দিরা' (১৮৭৩ ও ১৮৯৩), 'রাধারাণী' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) নিঃসংশয়ে আধুনিক সামাজিক বাস্তব উপন্যাস ; 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ও 'রাজসিংহ' (১৮৮২ ও ১৮৯৩) রোমান্স হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী রোমান্সের সহিত এক-পর্য্যায়ভুক্ত নয়। আমাদের প্রতিদিনের জীবযাত্রা হইতে ইহাদের ভূমিকার দূরত্ব সত্ত্বেও ইহাদের মুখ্য উপকরণ সেই দূরত্ব নয়। এই সকল উপন্যাসের মূল ঘাতপ্রতিঘাতের সহিত সমসাময়িক মানুষের মনোজগতের সংঘাতের মিল আছে। 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি উপন্যাসে ইতিহাসের আশ্রয় তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না ; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানস পুত্র ; ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাসিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিতান্ত

সামাজিক পটভূমিকায় প্রতাপ-শৈবলিনীকে লইয়া তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসে যে রীতি অবলম্বন করিয়াছেন, 'ইন্দিরা' ও 'রজনী'তে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়; সর্ব্বত্র উপন্যাসকার গল্প বলিয়াছেন, 'ইন্দিরা'য় ইন্দিরাই বক্তা, 'রজনী'তে বিভিন্ন চরিত্র নিজেরাই আপন আপন বক্তব্য বলিয়া গল্পের ধারা বজায় রাখিয়াছে। উইল্কি কলিন্সের *Woman in White*-এ অবলম্বিত পদ্ধতি যে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "বিজ্ঞাপনে" স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার নায়িকাও লর্ড লিটনের *Last Days of Pompeii*-এর অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার স্মরণে চিত্রিত হইয়াছে। নানা অসঙ্গতি ও অভাব সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের ইতিহাসে 'রজনী'র বিশিষ্ট স্থান থাকিবে; ইহা বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস। ইহাতে নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতকে ঘটনা-বৈচিত্র্যের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে; সে যুগের বর্ণনা-বহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলিকে তিনটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যায়, পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছি। প্রথম স্তরে, উদ্যোগপর্ব্বের তিনখানি উপন্যাস—'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'; তৃতীয় স্তরে 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'; বাকি সবগুলি গল্প ও উপন্যাস দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্গত। দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' এবং শেষ উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অবশ্য সময়ের দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র পরেও দ্বিতীয় স্তরে তাঁহার "ক্ষুদ্র কথা" 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'রাজসিংহ'কে উপন্যাসের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৮৩ পৃষ্ঠার

এই চটি গল্পের বইটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ সংস্করণে বর্ত্তমান রূপ গ্রহণ করে। বস্তুতঃ অধুনা-প্রচলিত 'রাজসিংহ'কে নানা কারণে তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

দ্বিতীয় স্তরের প্রথম উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র (১৮৭৮) প্রকৃতিগত সাদৃশ্য খুব ঘনিষ্ঠ। শেষোক্ত উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী সর্ব্বাপেক্ষা পরিণতি লাভ করিয়াছে। অনেকের মতে নিছক রসরচনা হিসাবে এইটিই তাঁহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ বই। কোনও কোনও সমসাময়িক লেখক এমনও সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'কে তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস মনে করিতেন।

দ্বিতীয় স্তরের শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে ১৩০০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "রাজসিংহ" প্রবন্ধে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই তাঁহার সত্য পরিচয়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' পুস্তকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ইহার পরেই মোড় ফিরিয়াছে; শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র জাতিগঠনের উদ্দেশ্য লইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এই নবতন পদ্ধতির প্রথম উপন্যাস। পরবর্ত্তী দুইটি উপন্যাস—'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) ও 'সীতারামে' (১৮৮৭) এই ধারাই পরিণতি লাভ করিয়াছে। "ত্রয়ী" নামে খ্যাত তাঁহার এই শেষ উপন্যাস-তিনটি উদ্দেশ্য ও প্রচার-দোষ-দুষ্ট বলিয়া বহু সাহিত্যিকের নিন্দাভাজন হইয়াছে; আবার অনেকে এই তিনটিকে তাঁহার পরিণত বয়সের মহোত্তম কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রথমোক্ত দলে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এবং শেষোক্ত দলে শ্রীঅরবিন্দ, পাঁচকড়ি

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন ঃ—

> এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙ্গালীর প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন। আনন্দমঠে সমষ্টির বা সমাজের ক্রিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ; দেবী চৌধুরাণীতে ব্যক্তিগত সাধনার উন্মেষ-প্রকরণ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন ; সীতারামে সমাজ ও সাধক সম্মিলিত হইলে কেমন করিয়া একটা State বা স্বতন্ত্র শাসন সৃষ্ট হইতে পারে, তাহার পর্য্যায় দেখাইয়াছেন।···সন্ন্যাসীর গৈরিক লেখা তাঁহার শেষ তিনখানি উপন্যাসে যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ, এই দুই জাতি ছাড়া সমাজের কোনরূপ ভাঙ্গা গড়া হয় নাই। তাই তিনি এই তিনখানি উপন্যাসে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।···এই তিনখানা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালিত্বের শ্লাঘা ও অপকর্ষ ফুটাইয়া দেখাইয়াছেন, কিছুই ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই।—'নারায়ণ', বৈশাখ, ১৩২২।

আসল কথা, শান্তিপর্ব্বে যে অনুশীলন-তত্ত্ব লইয়া তিনি অবিরত মাথা ঘামাইতেন, তাহারই সহজ প্রচারের জন্য তিনি এই তিনটি উপন্যাস প্রচারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এগুলিকে "অনুশীলনতত্ত্ব" প্রচারের একটা "কল" বলিয়া গিয়াছেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া পাদরী হেষ্টি 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্মের উপর যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, "রামচন্দ্র" এই ছদ্ম নামে তাহার জবাব দিতে গিয়া হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বগুলি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা প্রশ্ন জাগে। ইহা 'আনন্দমঠ' প্রকাশের অব্যবহিত পরের

ঘটনা। তৎকালীন প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত "পজিটিভিস্ট" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লিখিত বঙ্কিমের *Letters on Hinduism* ইহারই ফল। এই অসম্পূর্ণ পত্রগুলিতে হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। ইহার পরেই 'দেবী চৌধুরাণী'—ইহার দ্বিতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া 'বঙ্গদর্শন' বিলুপ্ত হয়। সম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়াতেই। ঐ বৎসরের জুলাই মাস (শ্রাবণ, ১২৯১) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র-পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকার আবির্ভাব ঘটে। ঐ শ্রাবণ মাস হইতেই অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবন' বাহির হইতে থাকে। এই দুইটি সাময়িক-পত্রের সহায়তায় বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার নূতন ধারণা প্রচার করিতে থাকেন। এই প্রচারে 'সীতারাম' অন্যতম "কল" মাত্র। প্রথম সংখ্যা 'প্রচার' হইতেই উহা বাহির হইয়া ১২৯৩ বঙ্গাব্দের মাঘ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়; মধ্যে কয়েক মাস বন্ধ ছিল।

মতবাদ যাহাই হউক, শিল্পসৃষ্টির দিক্ দিয়াও বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস তিনখানিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এইখানেই চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার সহিত 'সীতারামে'র ভাষা তুলনা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে নিত্য প্রগতিশীল ছিলেন। ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য তিনি অলঙ্কার ও অন্যান্য উপকরণ বর্জ্জন করিতে দ্বিধা করেন নাই। যাঁহারা মনে করেন, এই পর্ব্বের শেষের দিকে তাঁহার প্রচারবুদ্ধি শিল্পবুদ্ধিকে খণ্ডিত করিয়াছিল, তাঁহারা তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে প্রকাশিত 'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহে'র পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ভাল করিয়া দেখিলেই মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন। এই 'রাজসিংহ'ই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শেষ

জীবনে শিল্পসৃষ্টিকেই জীবনের চরম কীর্ত্তি মনে করিতে না পারিলেও শেষ পর্য্যন্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু ঘটে নাই।

যুদ্ধপর্ব্বের শেষের দিকে 'প্রচার' ও 'নবজীবন' মারফৎ বঙ্কিমচন্দ্র নানা তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া একটা ব্যাবহারিক হিন্দুধর্ম্ম আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন—'ধর্ম্মতত্ত্বে', 'কৃষ্ণচরিত্রে' এবং তাঁহার গীতা ও বেদের ব্যাখ্যায় তাহার সাক্ষ্য আছে। তিনি কদাপি জনতার মুখ চাহিয়া আপনার মতকে খাটো করেন নাই, সকল গোঁড়ামি ও অবিশ্বাসকে প্রয়োজনমত উপেক্ষা করিয়া নির্ভীকভাবে নিজের মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শিল্প-প্রতিভার গুণে এগুলিও বাংলা-সাহিত্যের বিষয় হইয়া আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

শান্তিপর্ব্ব

যুদ্ধপর্ব্বের শেষ কয়েক বৎসর হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে শান্তিপর্ব্ব প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। অর্থাৎ 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র সূচনাকাল হইতেই তিনি শান্তির পথসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন এবং পিতামহ ভীষ্মের মত পথভ্রান্ত বাঙালীকে পথের নির্দ্দেশ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে তিনি সম্মান করিতেন এবং সমসাময়িক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মবিস্মৃতিই হিন্দুজাতির অবনতির কারণ। আত্মবিস্মৃতকে আত্মসচেতন করাই তাঁহার শেষ জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই মহদুদ্দেশ্যে তিনি এক প্রকার আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বৎসরে ১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বঙ্কিমচন্দ্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র সমালোচনা

উপলক্ষ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্যকে যাঁহারা অপবিত্র, অরুচিকর ও অশ্লীল বিবেচনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলেন :—

> যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণ-গীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেননা অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই অনুসন্ধানের ফলই বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র'। এই ফল সম্পূর্ণ ফলিতে অনেক দেরি হইয়াছিল। তিনি কিছু কালের জন্য এই প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবন' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। 'প্রচারে'র আশ্বিন সংখ্যা হইতে পুনরায় 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভাগ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' (সম্পূর্ণ গ্রন্থ) বাহির হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

> বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্ত্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্ম্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহই লোকাচার দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।—'আধুনিক সাহিত্য'।

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'নবজীবনে'র প্রথম প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"। ইহাই 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র আদি। ঐ শ্রাবণ হইতে ১২৯২ সালের চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 'নবজীবনে' বিবিধ প্রবন্ধে তিনি অনুশীলন-ধর্ম্ম

বুঝাইতে চেষ্টা করেন। এইগুলিই পরিবর্ত্তিত আকারে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' নামে পুস্তকাকারে বাহির হয়।

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্র দেবতত্ত্ববিষয়ক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন, 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা'রও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। এই দুইটিই তিনি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা বাহির হয়। এই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে বাহির হয়। দেবতত্ত্ববিষয়ক অসম্পূর্ণ রচনা পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তাঁহার প্রতিভা কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে নাই। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে "সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেনে"র (পরে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট) সাহিত্য-বিভাগের সভাপতিরূপে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করেন। পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ইংরেজী খণ্ডে এগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

'প্রচার' যে বৎসর প্রচারিত হয়, সেই বৎসর উপন্যাসাদি লঘু রচনার বিরুদ্ধে তিনি প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন; কিন্তু পরে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হয় ও তিনি বলেন :—

> জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্য-জীবন বিচিত্র ও বহু বিষয়ক; এজন্য জ্ঞানেরও বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, "বিবিধ," পৃ. ৪০৪।

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই ভাবে ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞানকে সাধারণের বোধ্য করিবার জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে দুইখানি উপন্যাস রচনা করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছা কার্য্যকরী হয় নাই।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর তিনি বাংলা দেশের তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিকদিগকে নানা উপদেশ দিয়া সাহিত্য-সেবায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন; রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

বাংলা-সাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের প্রতি পিতামহ বঙ্কিম শান্তি-পর্ব্বে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের সার কথাগুলি এই ভাবে "নিবেদন" করিয়াছেন :—

> যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।...
>
> যাহা অসত্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য্য। সত্য ও ধর্ম্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশে লেখনীধারণ মহাপাপ।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ', ২য় ভাগ, পৃ. ২০৬।

পরিশেষে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্ব্বদা আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণকামনা করিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

> সাহিত্যও ধর্ম্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্ম্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম্ম, সমস্ত ধর্ম্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্ম্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্ম্মের মঞ্চে আরোহণ কর।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, 'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ১৮২।

শান্তিপর্ব্বে বাংলা-সাহিত্যে পিতামহ ভীষ্মস্থানীয় বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই চরম কথা। এই আদর্শ তিনি নিজের জীবনে পালন করিয়া গিয়াছেন। এই মতবাদের জন্য বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ সাহিত্য-শিল্পিসম্প্রদায় যে তাঁহাকে একদিন সাহিত্য-সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন, এই আশঙ্কা তিনি কখনই করেন নাই ; নির্ভীকভাবে জীবনের আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল।—

১। **ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।** ইং ১৮৫৬। পৃ. ৪১।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনা কালে গ্রন্থকার জানিতে পারেন নাই যে তিনি নূতন পদ্ধতির পরীক্ষা

পদবীরূঢ় হইয়াছেন। এবং তৎকালে স্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যদ্বয়কে সাধারণ সমীপবর্ত্তী করিবার কোন কল্পনা ছিল না কিন্তু কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর মনোনীত হইবায় তাঁহাদিগের অনুরোধানুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল।"

২। **দুর্গেশনন্দিনী।** ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। ইং ১৮৬৫। পৃ. ৩০৭।

৩। **কপালকুণ্ডলা।** ইং ১৮৬৬। পৃ. ১২৭।

৩ ডিসেম্বর ১৮৬৬ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' 'কপালকুণ্ডলা'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়।

৪। **মৃণালিনী।** ইং ১৮৬৯। পৃ. ২৪১।

৫। **বিষবৃক্ষ।** ইং ১৮৭৩। পৃ. ২১৩।

১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৬। **ইন্দিরা।** উপন্যাস। বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। ইং ১৮৭৩। পৃ. ৪৫।

১২৭৯ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণের পুস্তকে (১৮৯২, পৃ. ১৭৭) 'ইন্দিরা' "পুনর্লিখিত ও পরিবর্দ্ধিত" হয়।

৭। **যুগলাঙ্গুরীয়।** ইং ১৮৭৪। পৃ. ৩৬।

১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ইহা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পুস্তকাকারে বাহির হয়। ৯ আগষ্ট ১৮৭৪ তারিখের 'সাধারণী'তে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন-কার্য্যালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলির তালিকামধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহার মূল্য ছিল ৵১০।

৮। **লোকরহস্য**। ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত। কৌতুক ও রহস্য। ইং ১৮৭৪। পৃ. ৯৯।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ (পৃ. ১৭৪) প্রকাশিত হয়। "দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "লোকরহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্দ্ধেক পুরাতন ও অর্দ্ধেক নূতন। সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নূতন, আটটি পুরাতন ; এবং একটি (রামায়ণের সমালোচন) পুরাতন হইলেও নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকল গুলিই বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত।"

৯। **বিজ্ঞানরহস্য** অর্থাৎ ১২৭৯।৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৭০।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১২৯১ সাল, পৃ. ৭৯) "সর উইলিয়ম টমসনকৃত জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা" প্রবন্ধের পরিবর্ত্তে ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভ্রমরে' প্রকাশিত "চন্দ্রলোক" প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণেও ১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শন' হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত আছে।

১০। **চন্দ্রশেখর**। উপন্যাস। ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৯৫।

১২৮০ শ্রাবণ—১২৮১ ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১১। **রাধারাণী**। ইং ১৮৭৫।

১২৮২ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তক এখনও কোথাও দেখি নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৬৫) পরিবর্দ্ধিত।

১২। **কমলাকান্তের দপ্তর।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৭৫। পৃ. ১৬২।

ইহা প্রথমে ১২৮০-৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে; পুস্তকের আখ্যা-পত্রে এই তারিখই দেওয়া আছে। ১২৯২ সালে (ইং ১৮৮৫ ?) 'কমলাকান্ত' নামে (পৃ. ২৫০) ইহার পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এই গ্রন্থ কেবল 'কমলাকান্তের দপ্তরের' পুনঃ সংস্করণ নহে। "কমলাকান্তের দপ্তর" ভিন্ন ইহাতে "কমলাকান্তের পত্র" ও "কমলাকান্তের জোবানবন্দী" এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।…"চন্দ্রালোকে" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং "স্ত্রীলোকের রূপ" আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।…কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। "বুড়া বয়সের কথা" যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও "কমলাকান্তের পত্র"মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।"

'কমলাকান্ত' পুস্তকের পরবর্ত্তী সংস্করণে (ইং ১৮৯১ ?) ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "ঢেঁকি" নামক প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। এই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল দেওয়া নাই।

১৩। **বিবিধ সমালোচনা।** (বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৭৬। পৃ. ১৪৪।

গ্রন্থকার পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি

পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।"

১৪। **রজনী।** উপন্যাস। ইং ১৮৭৭। পৃ. ১২২।

ইহা প্রথমে ১২৮১-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে, যে ইহাকে নূতন গ্রন্থও বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে। প্রথম লর্ড লিটনপ্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি "কাণা ফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।"

১৫। **উপকথা।** অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ। ইং ১৮৭৭। পৃ. ৮৩।

ইহাতে 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' একত্র পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা দ্বিতীয় বার (পৃ. ৫৬) মুদ্রিত হয়।

১৬। **রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী।** ইং ১৮৭৭। পৃ. ১৷৷০।

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১২৮৩ সালে 'দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী'র সহিত প্রকাশিত হয়।

১৭। **কবিতাপুস্তক।** ইং ১৮৭৮। পৃ. ১১২।

'বঙ্গদর্শন' ও 'ভ্রমরে' প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্য-রচনা 'ললিতা' ও 'মানস' এই পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে (পৃ. ১৪৪) এই পুস্তকের নামকরণ হয় 'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক'। দ্বিতীয় বারের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "এবার একটি গদ্য প্রবন্ধ নূতন দেওয়া গেল। "পুষ্পনাটক" প্রথম 'প্রচারে' প্রকাশিত হইয়াছিল, এই প্রথম পুনর্মুদ্রিত হইল। "দুর্গোৎসব" 'বঙ্গদর্শন' হইতে, এবং "রাজার উপর রাজা" প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত করা গেল। 'কবিতা পুস্তক' অপেক্ষা 'গদ্য পদ্য' নামটি এই সংগ্রহের উপযোগী, এইজন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্ত্তন করা গেল।"

১৮। **কৃষ্ণকান্তের উইল।** ইং ১৮৭৮। পৃ. ১৭০।

১২৮২ ও ১২৮৪ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

১৯। **প্রবন্ধ-পুস্তক।** ইং ১৮৭৯। পৃ. ১৫৮।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে কোন তারিখ নাই। এই প্রবন্ধগুলি পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছিল; কেবল রাম শর্ম্মার প্রণীত "বুড়া বয়সের কথা" 'কমলাকান্ত' পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

২০। **সাম্য।** ইং ১৮৭৯। পৃ. ৬৮।

"এই প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ [১২৮০ ও ১২৮২ সালের] বঙ্গদর্শনের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঐ পত্রে [১২৭৯ সালে] প্রকাশিত "বঙ্গদেশের কৃষক" নামক প্রবন্ধ হইতে নীত।"

২১। **রাজসিংহ**। ক্ষুদ্র কথা। ইং ১৮৮২। পৃ. ৮৩।

১২৮৪ চৈত্র—১২৮৫ ভাদ্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণটি (পৃ. ৪৩৪) বর্ত্তমান আকারে "পুনঃপ্রণীত"।

২২। **আনন্দ মঠ।** ইং ১৮৮২। পৃ. ১৯১।

১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২৩। **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত**। (১২৮৭ সালের বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৮৪। পৃ. ৪৭।

২৪। **দেবী চৌধুরাণী।** ইং ১৮৮৪। পৃ. ২০৬।

১২৮৯-৯০ সালের 'বঙ্গদর্শনে' অংশতঃ প্রকাশিত।

২৫। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস**। ইং ১৮৮৬।

ইহাতে 'ইন্দিরা' (৪র্থ সং), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (৪র্থ সং), 'রাধারাণী' (৩য় সং) এবং 'রাজসিংহ' (২য় সং) একত্রে স্থান পাইয়াছে।

২৬। **কৃষ্ণ চরিত্র**। প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৬। পৃ. ১৯৮।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্র…'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল…প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু… আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই।…আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্মুদ্রিত করিয়া তৎপরে কৃষ্ণ চরিত্র পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্ম ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, "কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশমাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পবিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।"

২৭। **সীতারাম।** ইং ১৮৮৭। পৃ. ৪১৯।

প্রথম তিন বর্ষের 'প্রচারে' (১২৯১-৯৩) প্রকাশিত।

২৮। **বিবিধ প্রবন্ধ।** প্রথম ভাগ। ইং ১৮৮৭। পৃ. ২৮০।

পুস্তকের "বিজ্ঞাপনে" প্রকাশ, 'বিবিধ সমালোচনা' ও 'প্রবন্ধ পুস্তক' —"দুই খানি পৃথক সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে ঐ প্রবন্ধগুলি এক পুস্তকে সঙ্কলন করিয়া 'বিবিধ প্রবন্ধ' নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ পূর্ব্বে 'বিবিধ সমালোচনা' এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে' প্রকাশিত করা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

২৯। **ধর্ম্মতত্ত্ব।** প্রথম ভাগ। **অনুশীলন।** ইং ১৮৮৮। পৃ. ৩৫৯।

পুস্তকের "ভূমিকা"য় প্রকাশ, "এই গ্রন্থের কিয়দংশ নবজীবনে [১২৯১-৯২] প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

৩০। **বিবিধ প্রবন্ধ।** দ্বিতীয় ভাগ। (বঙ্গদর্শন ও প্রচার হইতে পুনর্মুদ্রিত) ইং ১৮৯২। পৃ. ৩৫৬।

৩১। **সহজ রচনাশিক্ষা।**

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ৪র্থ সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক (পৃ. ৩২) দেখিয়াছি।

৩২। **সহজ ইংরেজী শিক্ষা।**

ইহার ৩য় সংস্করণ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক আমরা এখনও দেখি নাই।

৩৩। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।** ইং ১৯০২। পৃ. ৩৭৮+৯।

দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় "সংগ্রহকারের নিবেদন"-স্বরূপ লিখিয়াছেন, "…'প্রচারে' [শ্রাবণ-পৌষ ১২৯৩ ; বৈশাখ-চৈত্র ১২৯৫] এই গীতাব্যাখ্যার প্রথম কিয়দংশ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।…প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।…

৩৪। **Rajmohan's Wife.** ইং ১৯৩৫। পৃ. ১৫৬।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রে এই ইংরেজী উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী'-কার্য্যালয় হইতে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজী উপন্যাসখানির প্রথম সাত অধ্যায় বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় *Rajmohan's Wife* পুস্তকের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ।

৩৫। **বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী**—জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ। ইং ১৯৩৮-৪২।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একমাত্র প্রামাণিক সংস্করণ। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকগুলি ছাড়া তাঁহার ইংরেজী-বাংলা প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থ

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছে। জার্মান, সোয়েডিশ ও ভারতীয় বহু ভাষাতেও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সকলগুলির তালিকা করা আপাততঃ সম্ভব নয়। বঙ্কিমের জীবিতকালে যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ অনুবাদ প্রকাশিত হয় :—

ইংরেজী : 'কপালকুণ্ডলা'—গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, *National Magazine*, Calcutta, 1876-77 ; 'দুর্গেশনন্দিনী'—চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, Calcutta, 1880 ; 'বিষবৃক্ষ'—Miriam S. Knight, London, 1884 ; 'কপালকুণ্ডলা'—H. A. D. Phillips, London, 1885.

জার্মান : 'কপালকুণ্ডলা', Curt Klemm, Leipzig, 1886.

হিন্দুস্থানী : 'দুর্গেশনন্দিনী', K. Krishna, Lucknow, 1876 ; 'মৃণালিনী'—K. Simha, Lucknow, 1880 ; 'বিষবৃক্ষ', G. Quadir, Sialkot, 1891 ; 'দেবী চৌধুরাণী', Tulasi Rama, Amritsar, 1893.

হিন্দী : 'যুগলাঙ্গুরীয়', K. R. Bhatt, Patna, 1880 ; 'দুর্গেশনন্দিনী', G. Simha, Benares, 1882.

কানাড়ী : 'দুর্গেশনন্দিনী', B. Venkatachar, Bangalore, 1885.

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্টক্‌হলম হইতে 'বিষবৃক্ষে'র সোয়েডিশ অনুবাদ *Det giftiga Tradet* নামে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্ভবতঃ বঙ্কিমের মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাশিত।

এই তালিকা সম্পূর্ণ না হইতেও পারে। পাঠকদের সুবিধার্থ আমরা বঙ্কিমের উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদের একটি স্বতন্ত্র তালিকা নিম্নে দিলাম। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর তাঁহার বহু পুস্তক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় (অনেকগুলি একাধিক বার) অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা এখনও সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই।

1. *Durgesa Nandini*; or, The Chieftain's Daughter: trans. into English prose by Charu Chandra Mookerjee. Calcutta, 1880.
2. *The Poison Tree*: trans. by Miriam S. Knight. With a preface by E. Arnold. London, 1884.
3. *Kopal Kundala*: trans. by H. A. D. Phillips. London, 1885.
4. *Krishna Kanta's Will*: trans. by Miriam S. Knight, with introduction, glossary, and notes by J. F. Blumhardt, M. A. London, 1895.
5. *The Two Rings*: trans. by Rakhal Chandra Banerjee, B. A. Calcutta, 1897.
6. *Sitaram*: trans. by Sibchandra Mukherji. Calcutta, 1903.
7. *Chandrasekhar*: trans. by Manmatha Nath Ray Chowdhury. Calcutta, [Nov.] 1904.
8. *Chandrashekhar*: trans. by Debendra Chandra Mullick. B. L. Calcutta, [Oct.] 1905.

9. *Ananda Math* : "*The Abbey of Bliss*" : trans. by Naresh Chandra Sen-Gupta. Calcutta, [28 Dec.] 1906.

10. *Radharani* : trans. by R. C. Maulik. Calcutta, 1910.

11. *Yugalanguriya* (The Story of the Two Rings) : trans. by P. N. Bose and H. W. B. Moreno. Calcutta, 1913.

12. *Krishnakanta's Will* : trans. by Dakshina Charan Roy. Calcutta, [1918] (Reviewed in the *Modern Review* for Feb. 1918.)

13. '*Indira and other Stories* : trans. by J. D, Anderson (Indira, Radharani, the Two Rings, Doctor Macrurus or Vyaghracharya Brihal-langul.) Calcutta, 1918.

14. *Kapalkundala* : trans. by Devendra Nath Ghosh. Calcutta, [Aug.] 1919.

15. *The Two Rings and Radharani* : trans. by D. C. Roy. Calcutta, 1919.

16. *Sree*, an Episode from Sitaram : trans. by P. N. Bose and Moreno. Calcutta, 1919.

17. *Rajani* : trans. by P. Majumdar. Calcutta, [Dec.] 1928.

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে প্রকাশিত *The Indian Magazine and Review* পত্রের মার্চ সংখ্যায় মিরিয়ম এস্. নাইট বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণগোলকে'র ইংরেজী অনুবাদ "The Globe of Gold" নামে প্রকাশ করেন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাটকাকারে অভিনয়

(ইং ১৮৭২—১৮৭৫)

৭ ডিসেম্বর ১৮৭২ তারিখে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সকল উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হয়, তাহার একটি তালিকা সঙ্কলিত হইল।—

অভিনীত পুস্তক	থিয়েটারের নাম	অভিনয়ের তারিখ
কপালকুণ্ডলা	ন্যাশনাল থিয়েটার	১৮৭৩—১০ মে
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—২০ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	—২৭ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	১৮৭৪— ৩ জানুয়ারি
কপালকুণ্ডলা	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	— ৭ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—১৪ ফেব্রুয়ারি
মৃণালিনী	ন্যাশনাল থিয়েটার	—১৪ ফেব্রুয়ারি
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—১৪ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—২১ ফেব্রুয়ারি
মৃণালিনী	গ্রেট ন্যাশমাল থিয়েটার	—২১ ফেব্রুয়ারি
ঐ	ঐ	—২৮ ফেব্রুয়ারি
কপালকুণ্ডলা	ঐ	— ৪ এপ্রিল
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	— ২ মে
ঐ	ঐ	—১৫ আগষ্ট
ঐ	ঐ	— ৩ অক্টোবর
ঐ	ঐ	— ৫ ডিসেম্বর
ঐ	ঐ	—১২ ডিসেম্বর
কপালকুণ্ডলা	ঐ	১৮৭৫—১৩ ফেব্রুয়ারি
দুর্গেশনন্দিনী	বেঙ্গল থিয়েটার	—২৫ মার্চ
বিষবৃক্ষ	গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার	— ১ মে

জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫) রাত্রি নয়টার সময় কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। এই জন্ম-তারিখ বঙ্কিমচন্দ্রের কোষ্ঠী হইতে গৃহীত।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ছয় বৎসর বয়সে মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। সেখানে তিনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চারি বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার সন্নিকটস্থ নারায়ণপুর গ্রামের পঞ্চমবর্ষীয়া একটি বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩ অক্টোবর ১১½ বৎসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা (কবিতা) এবং ২৩ এপ্রিল তারিখে প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ললিতা ও মানস' পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে রচনা করেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পান।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দুই বৎসরের জন্য মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' প্রকাশিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্ত্তিত এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান (দ্বিতীয় বিভাগ) অধিকার করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়েন।

এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইল। পরবর্ত্তী কালে ছাত্র-জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলিয়াছিলেন—

> আমি আপন চেষ্টায় যা কিছু শিখেছি। ছেলেবেলা হতে কোন শিক্ষকের কাছে কিছু শিখিনি। হুগলী কালেজে এক আধটু শিখেছিলাম ঈশান বাবুর কাছে। ক্লাসে কখনও থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হয়েছিল। বাপ থাক্‌তেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয় নি; নীতিশিক্ষা কখনও হয় নি।—'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃ. ১৯৪।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট তারিখের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের অর্ডারে যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টররূপে তাঁহার নিয়োগ বিজ্ঞাপিত হয়। ৭ই আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরীর দিন গণনা করা

হইলেও সম্ভবতঃ তিনি ২৩এ আগস্ট প্রথম কার্য্যে যোগদান করেন। যশোহরেই দীনবন্ধু মিত্রের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়।* এই পরিচয় উত্তরকালে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। যশোহরে অবস্থানকালে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন†, সুহৃদপ্রধান দীনবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্থানে স্থানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ;...।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি তিনি যশোহর হইতে মেদিনীপুরের নেগুয়াঁ মহকুমায় বদলি হইলেন ; ৭ই ফেব্রুয়ারি নেগুয়াঁ পৌঁছিয়া তিনি ৯ই তারিখে সেখানকার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরি-বাড়ীর কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হইল। দ্বাদশবর্ষীয়া পত্নীকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ম্মস্থানে লইয়া গেলেন। নেগুয়াঁয় অবস্থানকালে সমুদ্র ও অরণ্যের শোভা দেখিয়া 'কপালকুণ্ডলা'র বীজ তাঁহার মনে উপ্ত হয়।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন এবং সেখানে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি 'এডুকেশন গেজেটে' কিছু কিছু লিখিতেন। তাঁহার ইংরেজী উপন্যাস *Rajmohan's Wife* এবং প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' এখানেই অংশতঃ রচিত হয়। *Rajmohan's Wife* কিশোরীচাঁদ

---

* পূর্ণচন্দ্রের কথায়—প্রভাকরে লিখিবার সময় "পত্রের দ্বারা...ইঁহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল।...সর্ব্বদাই উভয়ে উভয়কে পত্র লিখিতেন, কখনও কখনও পত্রের ভিতর কবিতা থাকিত,—আদরের কবিতা, কখনও গালাগালির কবিতা থাকিত।"

† বঙ্কিমচন্দ্রের চাকুরীর ইতিহাসে এই ছুটির উল্লেখ নাই।

মিত্র-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' (*Indian Field*) পত্রে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়।

শচীশবাবু-প্রোক্ত ('বঙ্কিম-জীবনী', পৃ. ১০৮) বঙ্কিমচন্দ্রের *Adventures of a Young Hindu* নামক উপন্যাসের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ কালেই রচিত হওয়া সম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনা-শাসন সম্পর্কে সি. ই. বাক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছেন—

> While in charge of the Khulna sub-division (now a district) he helped very largely in suppressing river *dacoities* and establishing peace and order in the eastern canals....
>
> While at Khulna Bankim Chandra began a serial story named "Rajmohan's Wife" in the *Indian Field* newspaper, then edited by Kisori Chand Mitra. This was his first public literary effort. —*Bengal under the Lieutenant-Governors*, ii. 1079.

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণার বারুইপুর মহকুমায় বদলি হন। এখানে তিনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছিলেন; মধ্যে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিনের জন্য ডায়মণ্ড হারবার (১৮৬৪, অক্টোবর) ও আলিপুরে (১৮৬৭, আগস্ট) বদলি হন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বঙ্কিম-জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর; এই বৎসরে চট্টোপাধ্যায়-পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধের বীজ উপ্ত হয়। যাদবচন্দ্র উইল করিয়া কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন মধ্যম পুত্র সঞ্জীবচন্দ্র ও কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ করিয়া দেন। শ্যামাচরণ ও বঙ্কিমচন্দ্র ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হন। এই বৎসরেই তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়।

বারুইপুরে অবস্থানকালেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'র শেষাংশ লিখিয়া থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে কালীনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—

> এই সময়ের পূর্ব্ব হইতেই তিনি দুর্গেশনন্দিনী লিখিতেছিলেন। এ সময় তাঁহাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি, সাক্ষীর এজেহার লিখিতে লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া পড়িতেন, এবং হঠাৎ এজলাস পরিত্যাগ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে—তাঁহার study room-এ প্রস্থান করিতেন···।—'প্রদীপ', ১৩০৬, পৃ. ২১৯।

'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী'ও এই সময়ে রচিত হয়। 'কপালকুণ্ডলা' প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে। 'মৃণালিনী'র প্রকাশকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি কিছু দিনের জন্য কাশী ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। মধ্যে অস্থায়ী ভাবে তিনি বহরমপুরস্থ রাজশাহী কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টের কাজ করেন (১৮৭১, এপ্রিল), এবং শেষের তিন মাস অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত হয়।

বহরমপুরে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। "On the Origin of Hindu Festivals" ও "A Popular Literature for Bengal" নামক প্রবন্ধ দুইটি তিনি বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনে পাঠ করেন—

প্রথমটি বহরমপুরে আসিবার পূর্ব্বেই পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ দুইটি উক্ত সমিতির বিবরণী-বহিতে যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'দি ক্যালকাটা রিভিউ' ত্রৈমাসিকের ১০৪ ও ১০৬ (ইং ১৮৭১) সংখ্যায় যথাক্রমে তাঁহার "Bengali Literature" ও "Buddhism and the Sankhya Philosophy" বেনামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র শম্ভুচন্দ্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয় এবং ১৮৭২ ডিসেম্বর ও ১৮৭৩ মে মাসে যথাক্রমে উক্ত পত্রে তাঁহার "The Confessions of a Young Bengal" ও "The Study of Hindu Philosophy" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট এই সময়ে লিখিত কয়েকটি পত্র 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেসেণ্টে' বাহির হইয়াছে। এই সময়ে দেশীয় সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র নিন্দিত হইয়াছিলেন। যে সার্ জর্জ ক্যাম্পবেলকে তিনি পরে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই যে কেন সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তখনকার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

...According to his [Bunkim Chunder Chatterjee the Dy. Collector of Berhampoor] opinion, "much of the general feeling of distrust towards the Government which has often been the comment, is due to the action of the native press."...We are taken by surprise at the remarks of an educated native like Bunkim Babu, who holds no inconsiderable position in our society. Certainly in a free country such remarks from a person of Bunkim Babu's position would have brought down upon him universal condemnation, but under the pressure of a foreign government even the truest patriot turns a traitor to his country. —16 Octr. 1878.

...This mischievous remark of the Babu, as may be easily supposed, has met with the approval of his Honor....What Bunkim

Babu said was simply silly in the extreme. He might have as well said that the native press seeks the interests of the people.... If Babu Bunkim and Sir George following mean to insinuate that the native press sows sedition, we can only say that there is a vague and indefinite law on the subject, which might be easily enforced if necessary.

...Babu Bunkim Chandra draws but only Rupees 600 per mensem and already his zeal has met with the approbation of his Honor, and it is to be expected that a promotion would increase his zeal tenfold...Before concluding this we would make the remark regarding Bunkim Baboo which the late Mr. Anstey made of Mr. Paul when eulogising Lord Mayo. "I hope my learned colleague will meet his reward in after life as surely as he is to receive the reward here."—23 Octr. 1873.

'বঙ্গদর্শনে' পর-পর 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য' খণ্ডশঃ বাহির হইতে থাকে—বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও প্রবন্ধ এই সময়ে তিনি লিখিয়া প্রকাশ করেন। বহরমপুর থাকা কালেই 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরা' ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের কমাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের সহিত এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ লইয়া বহরমপুরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল; এই বিবাদ আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল। ৮ জানুয়ারি ও ১৫ জানুয়ারি (১৮৭৪) তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

We are grieved to learn from the *Moorshidabad Patrica* that Babu Bunkim Chunder Chatterjee, the Dy. Magt. while returning home from office on the 15th Dec. last, was assaulted by one Lt. Colonel Duffin of the Berhampore Cantonment, and received

several violent pushes at his hands. It appears that the Babu was passing in a palkee across a cricket ground where Mr. Duffin and some Europeans were playing. This was deemed a great *beadubee* on the part of the Babu and Mr. Duffin felt himself fully justified in chastising him with blows. The *Patrica* says that the Babu has brought a criminal case against his aggressor and it has caused as it ought great sensation in Berhampore.... —8 Jany. 1874.

...It appears that the Colonel and the Babu were perfect strangers to each other, and he did not know who he was when he affronted him. On being informed afterwards of the position of the Babu, Col. Duffin expressed deep contrition and a desire to apologise. The apology was made in due form in open Court where about a thousand spectators, native and European, were assembled.—15th Jany. 1874.

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১২৮০) কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিকাতা হইতে বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় সেখানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময়ে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'ভ্রমর' নামক একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে লিখিতেন ও ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মে বঙ্কিমচন্দ্র ২৪-পরগণা জিলার বারাসত মহকুমায় বদলি হন এবং সেখানে কয়েক মাস থাকিতে না থাকিতেই অক্টোবর মাসে মালদহে রোড-সেসের কাজে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন হইতে দীর্ঘ অবসর (প্রায় ৯ মাস) গ্রহণ করেন। এই সময়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রাধারাণী' (১৮৭৫) ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৫) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী' আরম্ভ হয়।

নয় মাস ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করেন। সেই সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা আসিতেন। এই সময়েই রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'এমারেল্ড বাওয়ারে' দ্বিতীয় কলেজ-রিইউনিয়ন নামক মিলন-সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলি হন এবং সেখানে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে তিনি অস্থায়ী ভাবে বর্দ্ধমান ডিবিসনের কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্ট নিযুক্ত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়া হইতেই হুগলী যাতায়াত করিতেন; 'বঙ্গদর্শন' ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূরা দমে যাদবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জীবচন্দ্রের পরিদর্শনে ও বঙ্কিমের সম্পাদনায় বাহির হইতেছিল। 'রজনী' ও 'রাধারাণী' শেষ হইয়া 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ধারাবাহিক ভাবে চলিতে চলিতেই হঠাৎ ১২৮২ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চের শেষ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিয়া দেন। 'বঙ্গদর্শনে'র গ্রাহক-সংখ্যা তখন খুব বেশী। ঠিক এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। যাদবচন্দ্র তাঁহার উইলে বঙ্কিমকে কাঁটালপাড়ার বাড়ীর অংশ দেন নাই; ভ্রাতাদের মধ্যেও সদ্ভাবের অপ্রতুল হইতেছিল। কিন্তু এগুলি ঠিক 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার কারণ না হইতে পারে। ছুটিতে কাঁটালপাড়ায় আরামে কাটাইয়া চাকুরীতে যোগ দিবার প্রাক্কালে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল; চাকুরীর চাপও ইহার কারণ হইতে পারে।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনা 'বিবিধ সমালোচন' নামে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি

The Bane of Life নাম দিয়া 'বিষবৃক্ষে'র অনুবাদ সুরু করেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে লাট-পত্নী লেডী এলিয়ট্‌কে এই অনুবাদই উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

এই সময়ে নবীনচন্দ্র সেন কাটালপাড়ার বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশের কথা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে লেখাপড়া করিয়া দান করিলেন (১২ অগ্রহায়ণ ১২৮৩)।

ধূমায়িত বহ্নি তখন জ্বলিয়াছে, ভ্রাতৃবিরোধ বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাস উঠাইয়া চুঁচুড়ায় একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সপরিবারে উঠিয়া গেলেন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় উহা পুনঃপ্রকাশিত হইল; অসমাপ্ত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সমাপ্ত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্রের "ক্ষণভিন্নসুহৃৎ" দীনবন্ধুর ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল; ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম-লিখিত জীবনী-সম্বলিত হইয়া দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইল।

হুগলীতে অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়—'রজনী' (১৮৭৭), 'উপকথা' (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে ১৮৭৭), 'কবিতাপুস্তক' (১৮৭৮), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'প্রবন্ধ-পুস্তক' (১৮৭৯), 'সাম্য' (১৮৭৯)।

চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাড়ীতে কলিকাতা হইতে হেমবাবু, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অনেকে যাতায়াত করিতেন; ভূদেববাবুর সহিত এই সময়ে তাঁহার খুবই দেখা-শোনা হইত। অধ্যাপক গোপালচন্দ্র

গুপ্ত, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ভূদেবের গৃহে সমবেত হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেনকে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি তৎকালে ভারতবর্ষের একটি ইতিহাস* ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাস রচনা করিতেছিলেন।

ডিবিসনাল কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্টাণ্টরূপেই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে হাবড়ায় বদলি হন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। হাবড়ায় আসিয়াই বিচারের রায় লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধে।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অস্থায়ী অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরী স্বরূপ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-রূপে অস্থায়ী ভাবে ২৪-পরগণায় আলিপুরে বদলি হন; মধ্যে মে মাসে কয়েক দিন বারাসতে ছিলেন। ১৮৮২, ১৭ই মে হইতে ৭ই আগস্ট পর্য্যন্ত পুনরায় আলিপুরে থাকিয়া ৮ই আগস্ট তারিখে তিনি জাজপুরে (কটক) বদলি হন।

উপরোক্ত সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' (১৮৮২) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

---

* বঙ্কিমচন্দ্র একটি খসড়া-খাতায় এই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই খাতায় নিম্নলিখিত ভাবে বিষয়-বিভাগ করা হইয়াছে—Character of the Ancient Hindus, Maritime power and habits, External commerce, Manners and customs (women and widow marriage), Dates of authors, Wealth of ancient India, Government, Military power, Arab expeditions, Arab Geographers, Historical and Miscellaneous.

হাবড়া হইতে কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্য্যন্ত বঙ্কিমের বাসা কলিকাতার বউবাজার স্ট্রীটে ছিল; সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত; 'আনন্দমঠে'র পাণ্ডুলিপি পড়া হইত। চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, তারাকুমার কবিরত্ন, বলাইচাঁদ দত্ত, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও সঞ্জীবচন্দ্র নিয়মিত সেই আড্ডায় জুটিতেন। বেঙ্গল গবর্মেণ্টের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদটি হঠাৎ লুপ্ত হওয়াতে সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে লইয়া 'বেঙ্গলী', 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' প্রভৃতি দৈনিক পত্রে খুব লেখালেখি হয়।

'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মতত্ত্ব এবং হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য লইয়া গভীরভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন—পজিটিভিজ্‌ম সম্বন্ধে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার আলোচনা হইত। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ ব্যাপারে এই সময়ে বঙ্কিমের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাদ হয়। সঞ্জীবের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' তখন অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ ব্লাইদকে অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটরীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেই দিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাটীতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ ছিল। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিম কলেজ-রিইউনিয়নের সভায় যোগদান করেন। ৫ই ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে কলিকাতায় সাংঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হয়—সেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' রচনা করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ আগস্ট হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র জাজপুরে ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে

জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ পাদরি হেষ্টির সহিত হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব লইয়া 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় তাঁহার বাদানুবাদ হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'আনন্দমঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমচন্দ্র হাবড়ায় বদলি হন। সেখানে আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েস্টমেকট্ সাহেবের সহিত তাঁহার খিটিমিটি বাধে। এই বিবাদের ফলে বঙ্কিমকে হয়ত চাকুরী ত্যাগ করিতে হইত, কিন্তু ওয়েস্টমেকট্ বদলি হওয়াতে তাহা করিতে হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা তখন কলিকাতায়, তিনি প্রথমে সেখান হইতে হাবড়া যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পরে বাধ্য হইয়া হাবড়ায় বাড়ী ভাড়া করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত বঙ্কিম হাবড়ায় ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ও দেবী চৌধুরাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'দেবী চৌধুরাণী' 'বঙ্গদর্শনে' সমাপ্ত না হইতেই 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়—সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় তাহা আর নিয়মিত বাহির হইতেছিল না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ পর্য্যন্ত (চৈত্র ১২৮৯, নবম বৎসর সম্পূর্ণ) কোনও প্রকারে বাহির হইয়া 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইয়া যায়। তখন চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন; বউবাজার স্ট্রীটের বরাট প্রেসের অঘোরনাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক হইতে (১৮৮৩ অক্টোবর) 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রকাশিত হইয়া মাঘ মাসে একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তখনও 'বঙ্গদর্শনে'র উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন এবং তাঁহারই আদেশে 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে

পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ হইতে 'প্রচার' প্রচারিত হয়। ইহার ঠিক ১৫ দিন পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকার প্রকাশ স্বরু হয়।*

'প্রচারে' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রকাশিত হইতে থাকে; 'ধর্ম্মতত্ত্ব—অনুশীলনে'র প্রবন্ধগুলি 'নবজীবনে' বাহির হয়। এই দুই পত্রিকার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার পরিণত বয়সের মতামত প্রচার করিতে থাকেন। 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাতে সে সময় সাহিত্য-সমাজে বিশেষ আলোড়ন হইয়াছিল। এই তর্কের ফলে বঙ্কিমের মতামতগুলি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনীর আড়ালে থাকিয়া যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কৈলাসচন্দ্র সিংহ ও রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য। চন্দ্রনাথ বসু এই যুদ্ধে বঙ্কিমের পক্ষে ছিলেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্রকে ঝিনিদহ (যশোহর), ভদ্রক (কটক), হাবড়া ও মেদিনীপুর ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। এই ৩২ মাস সময়ের মধ্যে ১৩ মাস তিনি অসুস্থতাবশতঃ ছুটিতে কাটাইয়াছেন। তিনি হাঁপানিতে

* "নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।"—বঙ্কিমচন্দ্র।

এই কালে খুব ভুগিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে 'প্রচারে' তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ আগস্ট তারিখে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'রাজসিংহ' একত্র 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' নামে বাহির হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'কবিতাসংগ্রহ, ১ম ভাগ' তাঁহার সম্পাদনায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তল্লিখিত "জীবনচরিত ও কবিত্ববিষয়ক প্রবন্ধ"-সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র দ্বিতীয় পরিবর্ত্তিত সংস্করণ 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সীতারাম' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম ভাগ' পুস্তকাকারে বাহির হয়।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখস্থ প্রতাপ চাটুজ্জের গলিতে একটি বাটী খরিদ করিয়া সেখানেই বাস করিতে থাকেন। তখন তিনি হাবড়ায় ডেপুটি ছিলেন; ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি মেদিনীপুর যান। তৎপূর্ব্বে ৬ মাসের ছুটি লইয়া তিনি বিশ্রাম ও হৃত স্বাস্থ্য লাভের চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ মার্চ তারিখে তিনি জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর-ভারত পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। মির্জ্জাপুর, বিন্ধ্যাচল, কাশী, আগ্রা হইয়া তাঁহারা মথুরা-বৃন্দাবন অবধি গিয়াছিলেন। মথুরায় জ্যেষ্ঠের সহিত সঞ্জীব ও বঙ্কিমের মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি একা জয়পুর চলিয়া যান। বঙ্কিম ও সঞ্জীবচন্দ্র এলাহাবাদে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ মার্চ তারিখের সন্ধ্যায় এলাহাবাদের খসরুবাগে তাঁহাকে লইয়া একটি সাহিত্য-সভা হয়। প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভায় উপস্থিত

ছিলেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। 'প্রচার' পত্রিকায় এই সময় তাঁহার 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহা সম্পূর্ণ হয় নাই; কারণ, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'প্রচার' বন্ধ হয়।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল তারিখে মেদিনীপুর হইতে বঙ্কিম আলিপুরে বদলি হন। কলিকাতার বাড়ী হইতেই তিনি আলিপুর যাতায়াত করিতেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন' প্রকাশিত হয়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চাকুরী করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতাতেই অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত নূতন অথবা পরিবর্দ্ধিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।—

'গদ্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক' —১৮৯১
'বিবিধ প্রবন্ধ', দ্বিতীয় ভাগ—১৮৯২
'কৃষ্ণচরিত্র', ২য় সংস্করণ—১৮৯২
'ইন্দিরা', ৫ম সংস্করণ—১৮৯৩
'রাধারাণী', ৪র্থ সংস্করণ—১৮৯৩
'রাজসিংহ', ৪র্থ সংস্করণ—১৮৯৩

তাঁহার 'সহজ রচনা শিক্ষা' ও 'সহজ ইংরেজী শিক্ষা' এই কালেই প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengali Selections' প্রকাশ করেন। টেকচাঁদ ঠাকুরের যে গ্রন্থাবলী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'লুপ্ত-রত্নোদ্ধার' নামে প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার ভূমিকা লিখিয়া দেন,

এবং ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী-সুধা' নাম দিয়া সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা-সঙ্কলন সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী সহ প্রকাশ করেন।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রায় বাহাদুর ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলাকে পরীক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে "শিক্ষার হের-ফের" শীর্ষক একটি বক্তৃতা পাঠ করেন। উহা ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় বাহির হয়। প্রবন্ধটি পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে এক পত্র লেখেন। পত্রখানি অংশতঃ ঐ বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের টিপ্পনী সমেত প্রকাশিত হয়। সেই অংশ এই—

> বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, "পৌষ মাসের সাধনার প্রকাশিত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"—কিন্তু কেন যে তাঁহার "ক্ষীণস্বর" কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট হৌসের মহতী সভা "অসংখ্যবালক-বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে" কিরূপ চরম সদ্গতির অধিকারী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যদি বা কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণবাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।—পৃ. ৪৪০-৪১।

সেন্ট্রাল টেক্স্ট বুক কমিটির ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা

ভাষা ও সাহিত্যের সাব-কমিটিতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পাওয়া যায়।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামীয় সভার প্রতিষ্ঠা-দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্ত্তিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তি—উক্ত সভার উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে'র ঐ বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

বঙ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই; তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী ও উৎপলকুমারী। তাহারা কেহই এখন বর্ত্তমান নাই।